ছয়ঃ উত্তর বঙ্গের ছয়টি জেলার নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও চিঠি পত্রের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের নাট্যায়ন সম্পর্কে তাদের মতামত ঃ

উত্তরবঙ্গের নাটক, নাট্য-প্রযোজনা, নাট্য-উপস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে এই অঞ্চলের নাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক যে মতামতগুলি পাওয়া গিয়েছে, আমরা সে মতামতগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা নিয়ে একটি বিশ্লেষণী-আলোচনা এই অধ্যায়ে তুলে ধরবো । এই আলোচনায় নাট্যব্যক্তিত্বগণের মতামত হুবহু তুলে ধরার প্রয়াস থেকে বিরত থাকবো । প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি এখানে আলোচিত হবে মাত্র । উত্তরবঙ্গের জনা-ত্রিশেক নাট্য-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছি এবং তাঁদের কাছে নাট্যসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছি। তার মধ্যে আমরা উত্তর পেয়েছি মোট এগার জনের। এই উত্তরগুলির মধ্যে কোন কোনটি যথেষ্ট সুচিন্তিত ও তথ্যানুগত, কোন কোনটি আবেগ তাড়িত ও তথ্য বিকৃত । সুতরাং এই উত্তর পত্রগুলির সারাংশ গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে । তাঁদের মতামতের অসার অংশগুলি বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক সারাংশটুকু এখানে তুলে ধরা হলো । তাঁদের এই মতামতগুলি উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যতের নাট্যকারদের পথ-নির্দেশ করতে পারবে বলে আমরা মনে করি । প্রসঙ্গত: বলা যায় আমরা সকলের কাছে একই রকম প্রশ্ন করিনি । স্থানভেদে ও ব্যক্তিভেদে আমরা আলাদা আলাদা প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম এবং তাঁদের কাছে থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতেই এই অধ্যায়টি রচিত হলো ।

প্রশ্ন : কোচবিহারের নাট্যচর্চায় স্বাধীনতার পূর্বকাল পর্য্যন্ত সামাজিক এবং স্বাধীনতার আন্দোলনমুখী নাটকের রচনা এবং মঞ্চাভিনয় হয়নি কেন ?

এই প্রশ্নভিত্তিক উত্তরে কোচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত প্রৌঢ় নট-নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক শ্রী নীরজ বিশ্বাসের অভিমত:

"কোচবিহারে তখন রাজা মহারাজারা ব্রিটিশের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন । ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় — অনেক সাহসী বীর নৃপতিরাও মুসলিম আমলের সময় থেকেই দাপিয়ে উঠলেও প্রকৃত পক্ষে শহীদ করেছিলেন বহু সৈন্যকে এবং নিজেরাও শেষ অবধি কেউ বন্দী হয়েছিলেন । এই তো হয়। সে সময় বা তার পরবর্তীকালেই ব্রিটিশের করদমিত্র রাজ্য এই কোচবিহার কিভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে ব্রিটিশ সম্রাটের বিরূদ্ধে? তাই শত চেষ্টা করেও বহু বীরের সন্ধান পাওয়া গেলেও ব্রিটিশ-বিরোধী হয়ে উঠতে দেখা যায়নি কাউকে । সুখ-শান্তি ভরা রাজ্যে তাঁরা প্রজাদের সুখে রাখতে, নিজেদের স্বস্তিতে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন । এই পথই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন। অন্য রাজাদের মতো কোচবিহরের ইতিহাসও তাই ।

পরবর্তীকালে যখন উত্তরণ ঘটেছে যুগের, দ্রুততার সঙ্গে তখন সাংস্কৃতিক দিকের উন্নয়ন ঘটেছে । ফলে প্রায় আধুনিক যুগে আমরা বহু নাটকের দেখা পেয়েছি । রাজা-সম্রাটের কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদেরও পরতে হয়েছে রাজা মহারাজার পোষাক । হাতে তরবারি নিয়ে লম্ফঝম্প দিয়ে নৃপতিত্ব প্রকাশ করতে হয়েছে । এর ফলে রোজগার বলতে ঐ হাততালি । প্রকৃত পক্ষে ভারতের ইতি হাসে এই অবস্থায় নাটক কী সাহায্য করতে পেরেছে ? সে তো একেবারে আধুনিক কালের অল্প কয়েকটি নাটক ও নাট্যকার ছাড়া আর কোথায় ?"

শ্রী নীরজ বিশ্বাসের উদ্ধৃত অভিমতটি উদ্ধৃত প্রশ্ন-সাপেক্ষে যথাযথ । রাজন্যশাসিত কোচবিহার রাজ্যে ১৯৫০ খ্রী: ১ জানুয়ারী সময়কাল পর্য্যন্ত স্বাধীনতা-আন্দোলনমুখী কোনো নাটক বা সামাজিক ভাবনার নবায়ন সম্পৃক্ত কোনো নাটক রচিত এবং অভিনীত হতে পারে নি । সে ধরনের দু /একটি চেষ্টা যে হয়নি, তা নয় । তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোচবিহার রাজ্য পরিত্যাগ করতে হতো । রাজন্যবর্গের এ ধরণের মানসিকতা বেশ স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে ১৯২২ সালের ৩১ জানুয়ারী কোচবিহার রাজ্যের স্টেট কাউন্সিলের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে । ২ নং সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে -- "খাদির কাপড় ব্যবহার করার বিষয়ে কোন বাঁধানিষেধ নাই , কিন্তু রাজ্যের কর্মচারীগণ 'গান্ধীটুপি ' ব্যবহার করিতে পারিবেন না, কারণ এই রাজ্যে মহারাজ ব্যতীত অন্য প্রাধান্য মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে । যদি কোন ব্যাক্তি স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক ব্যাজ ধারণ করে অথবা কোন চিহ্ন ব্যবহার করে, তবে তাহাকে উহা খুলিয়া ফেলিতে বলা হইবে । যদি সে নির্দেশমত কাজ না করে,তবে রাজ্যের আইন অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।'

কোচবিহার রাজ্যের ভিক্‌টোরিয়া কলেজ (বর্তমান এ. বি. এন. শীল কলেজ) ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার বিষয় নিয়ে কোচবিহারের তদানীন্তন মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন --" It has been reported to me that there was some trouble among the students of my college here over the movement generally known as Non- Co-operation. Before I say anything on the subject, I want to impress upon you the difference between the Victoria college , Cooch Behar and colleges in the British districts in Bengal . The victoria college was established primarily and entirely for my subjects and those who come and join this college from British India are only allowed to do so if there are vacancies in the classes after admitting my subjects . Besides, those who come from British India get benefits and facilities which I need not mention here , but which they donot get in their native districts ... To them, I would say, if you donot like the system of education which I have adopted for my college, there is nothing to prevent you from going else where to seek the system you want. " [২]

কোচবিহারে গণনাট্য আন্দোলনের উদ্ভব ও ব্যর্থতা এবং এই জেলায় গ্রুপ থিয়েটারের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্ষীয়ান নট-নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক শ্রী নীরজ বিশ্বাসের অভিমত :-

" আমার দাদা (বিরাজ বিশ্বাস) বলতেন নাটক মানেই তো জাতীয় কলা । সেটা ফাটাফাটিই হোক বা সামাজিক কিছুই হোক । কথা তো মানুষের,মানুষ মানেই জনতা, গণেশ । বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ মানুষকে গণেশ বলতেন। তবে বর্তমান দশকে জনতাকে গণ তে পরিণত করে গণনাট্য হিসাবে যা বলা হচ্ছে , তাতে একটি দিক বিশেষ ভাবে তুলে ধরা হচ্ছে । বলতে পারা যায় Haven'ts এর দশের কথা । কিন্তু তা ছাড়িয়ে উঠছে রাজনৈতিক দলের ভাষণের মতো কিছু । ফলে দর্শকরা অভিনয়ের প্রশংসা করছেন বটে , নাটক বা নাট্যকারকে চিনে নিচ্ছেন বিশেষ রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ।

সত্যিকথা বলতে কোচবিহারে তখন সাংস্কৃতিক সংঘ ক্লাসিক্যাল ব্যাপারে মত্ত ছিল — পুজোর সময় পাড়ায় নাটকও ঐতিহাসিকেই সীমাবদ্ধ থাকতো, বা শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ঘরোয়া কিছু করে আনন্দে মেতে উঠতো। তার মধ্যে প্রমথনাথ বিশী'র 'ঋণং কৃত্বা' এবং 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটক জমে উঠতো রাজনীতি ছাড়াই । বিধায়ক ভট্টাচার্য, শচীন সেন গুপ্তের নাটক চলতো রমরমিয়ে । পরে দেখেছি একাঙ্ক অভিনয় হতে — দু একটা আমরাও করেছি । তারপর ভেবেছি নাটক বলতে কিছু . . . । তবুও একদল অভিনেতা সেই সময় গোষ্ঠী করে ফেলেছিলেন । তথাকথিত জনতার নাটক একের পর এক অভিনয়ও করেছিলেন । এতে পটভূমিকা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে চলে যেত। থিয়েটার ইউনিট, সপ্তর্ষি, খাগড়াবাড়ির কয়েকটি নাট্যদল এসবে বেশ জমিয়ে দিয়েছিল । দীপায়ন ভট্টাচার্য্যের ইন্দ্রায়ুধ গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জনতার নাটক ছাড়া অন্য নাটকে বিশেষ জুৎ পেতেন না । এদিক থেকে দেখা যায় খাগড়াবাড়ির নাট্যসংঘ, খাগড়াবাড়ীক্লাব, থিয়েটার ইউনিট, ইন্দ্রায়ুধ, সপ্তর্ষি এবং প্রসূনের পরবর্তী নাট্যদল বর্ণনা রীতিমতো গণমুখী নাটকে মাতিয়ে দিয়েছিল । ঐ জাতীয় একটি নাটক করে প্রায় বিশ্বজয়ের আনন্দ পেয়েছিল কোচবিহারের স্টেট্ ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব । ফল কি হয়েছিল ? ওর পরে আর দ্বিতীয় কোন নাটক তেমন ভাবে জমাতেই পারেনি এরা । এখানেই গণনাটকের ট্রাজেডি । এতে ডুবে গেলে অন্য পথ খুঁজে পাওয়া কঠিন । পরবর্তীকালে কোচবিহারের নাট্যপ্রচেষ্টা তাই দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়েছে । এখনও হচ্ছে । এখন সরকারী সাহায্যে ঐ জাতীয় নাটক অভিনীত হচ্ছে বটে — কিন্তু তেমন ভাবে ধরলে শূন্য ছাড়া কিছুই লাভ হয়নি । হতেও পারে না ।

ও ভাবেই টানতে টানতে চলেছে কয়েকটি মাত্র গোষ্ঠী । দিনহাটা, তুফানগঞ্জ , মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি মহকুমা-শহর গুলিতে খুঁজে দেখলে ৬০ এর পরেও চলছে ধুক্ ধুক্ করে । আঙ্গুলে গুণে সমস্ত জেলার কথা বলা যায় । সেদিক থেকে বালুরঘাটে সররকমের নাটক অভিনীত হচ্ছে মূলত: দুটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে এবং এখন এরাই উত্তরবাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-জেলা ।

গ্রুপ থিয়েটার তাই নাটককে কিছু দেয়নি, দিয়েছে ব্যথা । দিয়েছে ইতিহসের কথা ভাববার স্বপ্ন । বলেছে —না, একই ভাবে কোন কিছু চলতে পারেনা । রাজনীতির সঙ্গে সংস্কৃতি জড়িয়ে ফেললে তা থেকে পূর্ণতা পাওয়া সম্ভব নয় কোন কালেই ।"

শ্রী বিশ্বাসের অভিমত ব্যথাহত নাট্যকারের আবেগ-উৎক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ ধ্বনি হলেও এর মধ্যে যথার্থতা বর্তমান। প্রথমত: গণনাট্য গণদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত । কিন্তু প্রচলিত গণনাট্যে সেই গণদেবতা অর্থাৎ জনতা সার্বিকতার রূপ লাভ করেনি । জনতার বিশেষ শ্রেণী তাতে সামিল হয় এবং তাও আবার সময়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় । এভাবে রাজনীতির তাত্ত্বিকতার নীরস বক্তব্য এখানে যতটা প্রতিফলিত, কাহিনীর রসাস্বাদ ততোটা হৃদয়গ্রাহী হয়নি। নাটকের একপেশে আদর্শের একঘেয়েমিতে জনতার সেই বিশেষ শ্রেণীও ক্লান্ত এবং পরিশেষে বিষাদগ্রস্ত । তাই ষাটের দশক থেকে কোচবিহারে যদিও বা গণনাট্যের উদ্ভব ঘটে, অচিরকাল মাধ্যই তা ব্যর্থতায় পরিণত হয় ।

গ্রুপ থিয়েটারও সেই একই পথ ধরে অর্থাৎ রাজনীতির নবায়নের রূপ সাংস্কৃতিক মোড়কে বেঁধে জনতার দরবারে পৌঁছে দেবার শৈল্পিক পথ গ্রহণ করে । জনতা প্রথম প্রথম নিজেদের সামাজিক বঞ্চনার ছবি মঞ্চে দেখে সাঙ্গীকরণ করতে শুরু করে । কিন্তু সেই একই বঞ্চনার ইতিহাস, অবক্ষয়ের দোলা জনতার মধ্যে উদাসীনতার ঘুম জাগায় — জনতা হাতড়িয়ে বেড়াতে শুরু করে নাটকের নান্দনিকতাকে । তাই কোচবিহারে ৭০ এর দশক থেকে যে সমস্ত গ্রুপ থিয়েটার প্রথম প্রথম জেলা ও মহকুমাশহর গুলিতে দাপিয়ে বেড়িয়েছে, সেগুলি এখন হতমান । সেগুলি এখন নাট্যসংস্কৃতিকে স্বাধীনভাবে এগিয়ে নিয়ে চলার ভাবনায় ব্যস্ত । তাই গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যা কিনা শ্রী বিশ্বাসের অভিমতে ইঙ্গিতায়িত হয়েছে, তা হলো গ্রুপ থিয়েটারগুলি কেবলই সাংস্কৃতিক সুন্দরের প্রকাশমুখী প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে চলবে — ক্ষণকালের দ্যুতির দ্যোতনা নয়, অনন্ত কালের চিরায়ত মানবিকতার নাট্যপ্রয়াস হয়ে উঠবে । এখান নাট্যব্যক্তিত্ব গঙ্গাপদ বসু'র মন্তব্য প্রাসঙ্গিক ভাবে স্মরণীয় — "নাট্য-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ যদি সবচেয়ে বড় কোন প্রয়োজন থেকে থাকে, তবে সেটা সৃষ্টির এবং স্রষ্টার । তাত্ত্বিক নয়, তার্কিক নয়, অভিভাবক নয়, নাট্যশাস্ত্রীও নয়, সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কর্মের ও কর্মীর । . . . নাট্য-আন্দোলন হচ্ছে কর্মী, স্রষ্টা ও সৃষ্টির কষ্টি পাথর । এরা পরস্পরের পরিপূরকও বটে । একে অন্যকে পরিপুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করে । এই ই নিয়ম । পৃথিবীর বিভিন্ন নাট্য সংস্কৃতির ধারায় এইটেই ঐতিহাসিক সত্য ।" [৩]

Tulane Drama Review (Tulane University প্রকাশনা) পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেছে — " Our artistic lives become lonely pilgrimages toward individual rewards. It is, as if , the American attitude refuses to recognise the validity of the ensemble. When we join a group, we do so for ' our own sake,' and we remain with the group untill it can no longer ' offer us anything'. But most of the time, we work in complete isolation from play to play, satisfying our urge to a ' higher purpose' with the nation that we are working for 'The theatre'. But 'The Theatre' — the idea of one great all-encompassing goal — is nothing more than a screen for exploitation of the most wide spread and dangerous kind .... "[৪]

আমেরিকার ক্ষেত্রে যেমন Broad way Theatre এবং Off broad way theatre — এ দুয়ের মধ্যে যে আদর্শগত বিরোধ ছিল, তা লুপ্ত হতে চলেছে বর্তমান শতকের অতিক্রান্ত মধ্যভাগ থেকে — আমাদের দেশের ক্ষেত্রে Commodity theatre এবং group-theatre' এর প্রচেষ্টাও আজ প্রায় একই মেরুতে পৌঁছুতে শুরু করে দিয়েছে। এক্ষেত্রেই গ্রুপ থিয়েটাবের আন্দোলন ক্রমশ: ক্ষীণ হয়ে আসছে । খরিদ্দার বা জনতা প্রভু'র সমান এই উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ 'off Broad way ' হওয়ার চেষ্টা, আর 'Broad way' এর জৌলুসে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা — এই উভয় চেষ্টার ফল প্রভূত পক্ষে একই — " Two theatre worlds are rapidly opproaching each other. There will be no collision , only a muddled merger . . . we can not hope to build responsible community of theatres untill we clarify our intentions concerning each of them and then work coherently within our projected goals . . . The blurred lines must be redrawn with emphatic clarity. "[৫]

প্রশ্ন : বঙ্গীয় নাট্যচর্চার (নাট্যরচনা এবং মঞ্চাভিনয়) ধারায় উত্তরবঙ্গের অবস্থান উপেক্ষিত কেন — এ বিষয়ে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

উক্ত প্রশ্ন সাপেক্ষে কোচবিহারের নট-নাট্যকার এবং নাট্য-নির্দেশক শ্রী নীরজ বিশ্বাসের অভিমত :

" ব্রিটিশ রাজত্বের মূল শেকড় কলকাতাকে ঘিরে বিস্তৃতি লাভ করে । ব্রিটিশের নাট্য-রসিকতা সর্বজন বিদিত । ব্রিটিশ তথা ইংরেজের নাট্য-সংস্কৃতি (মঞ্চ এবং মঞ্চাভিনয়) বিস্তারের পূর্বে বঙ্গীয় নাট্য-রসিকতার যথাযোগ্য জরায়ু ছিল উত্তরবঙ্গ । অবশ্য তা ইংরেজের থিয়েটার ফর্মে নয়, নেহাতই লোকনাটকের ফর্মে। তাই ইংরেজের ঐতিহ্যগত সৌখীন থিয়েটারের বৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টি ইংরেজের শিক্ষা-সংস্কৃতি , রুচি প্রভৃতির আদলে

গঠিত কলকাতাতেই ঘটে — ব্রাত্য হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গ। এ যেন ঠিক আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশে অনার্য সংস্কৃতির ব্রাত্য হওয়ার অবস্থার মতো।

পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় ইংরেজ প্রচলিত শিক্ষার আধুনিকতা থেকে উত্তরবঙ্গ বিচ্ছিন্ন। প্রশাসন এবং চা বাগিচা'র (সাম্রাজ্য বিস্তার এবং আর্থিক সংস্কার) প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গে বেশ কিছু ইংরেজ সাহেবের আগমন ঘটে। তারা নিজেদের সখ-সৌখিনতার তাগিদে উত্তরবঙ্গের গঞ্জ এবং চা-বাগান গুলিতে অস্থায়ী ক্লাব এবং নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটায় এবং তার বিস্তৃতি নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে।

স্বাধীনোত্তর পর্বেও সেই একই অবস্থা বর্তমান। বাংলার রাজনৈতিক সাম্রাজ্য কলকাতা কেন্দ্রিক, সাহিত্য-সংস্কৃতির সাম্রাজ্যও তথৈবচ। বহু কাল পরে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে প্রাপ্ত কোচবিহার রাজ এবং অহোম রাজের মধ্যে পত্রালাপের গদ্যরীতিকে (১৮৫৫ খ্রী:)বাংলার গদ্য রীতির প্রথম পরিচয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ইউরোপীয়ান থিয়েটার-চর্চায় উত্তরবঙ্গ যে নিঃসন্দেহে উপেক্ষিত থাকবে — এ কথা বলার অবকাশ রাখেনা।"

শ্রী বিশ্বাসের অভিমত অংশত : সমর্থন যোগ্য। বঙ্গীয় নাট্য চর্চার ধারায় উত্তরবঙ্গ উপেক্ষিত থাকার পিছনে অন্য কারণও আছে। উত্তরবঙ্গ পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শ লাভ করে কলকাতার অনেক পরে। কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও সময় সাপেক্ষ এবং কষ্ট সাধ্য ছিল। সদ্য স্বাধীনোত্তর কালে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। উত্তরবঙ্গে কলকাতার মতো পেশাদারী নাট্যসংস্থা নেই — যাতে পেশাদারী নিপুনতা মঞ্চাভিনয়ে ফুটে ওঠে। এ ছাড়াও এখানে নাট্যামোদী দর্শকের অভাব। ফলে এখানে কোন নাট্য-প্রযোজনা বহু মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতায় পরিশীলিত হতে পারে না। উপরন্তু এখানে প্রতিটি নাট্যসংস্থা — সৌখীন বা গ্রুপ থিয়েটার বা পঞ্চাশের দশকের গণনাট্যও হউক না কেন — প্রায় প্রতিটি নাট্যসংস্থার ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক, মঞ্চশিল্পী এবং অনেক সময় নটশিল্পী'র দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে কোনোটাতেই ইপ্সিত উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব হয় না। এ সমস্ত কারণে দু /একটি প্রযোজনা বাদে কোনো নাট্য-প্রযোজনাই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়নি। এ ছাড়াও স্থানীয় পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা, প্রচার মাধ্যম প্রভৃতির অভাব উত্তরবঙ্গে লক্ষণীয়। সে কারণে সফল নাট্যাভিনয় এবং সার্থক নাট্য রচনা অনেক সময় নাগরিক দর্পণের অন্তরালে থেকে যায়। যদিও এত সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও বালুরঘাটের ত্রিতীর্থের নাট্য-প্রযোজনা গ্যালিলিও, দেবাংশী কলকাতার কুলীন দর্শকের নজর কেড়েছে এবং উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট বর্তমানে বঙ্গীয় নাট্যচর্চার ধারায় নিজের স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এটি একটি শুভ দিক।

প্রশ্ন : ৬০' এর দশক থেকে ৭০' এর শেষ লগ্ন পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় কি ? এ বিষয়ে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

এই প্রশ্নটির উত্তরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার বর্ষীয়ান নট-নাট্যকার এবং নাট্য-নির্দেশক অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায় বলেন — "

'যদিও জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে,
তুইও তাই বলবি, বাঁধা পথে চলবি ?
আগে-পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছলবি ?'

কোন সৎ নাট্যকার এবং নাট্যদল জগতের কল্‌জেটা যখন জ্বলতে থাকে অত্যাচারে, অবিচারে, অন্যায়ে, শোষণ-পেষণে, মনুষত্বের অবমাননায় — তখন সেই অস্থিরতা বিদ্ধ অবস্থায় চুপ করে থেকে আত্ম প্রতারণা করতে পারেন না। কেউই পারেন নি। তাই একজন সৎ নাট্যকার নাটকের মাধ্যমে, অভিনয়ের মাধ্যমে দেশের তথাকথিত সেই গণশত্রুদের মুখোস খুলে দিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন।

৬০' এর দশক থেকে ৭০' এর শেষ লগ্ন পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গের নাট্য চর্চায় অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় এবং এই অস্থিরতা নাট্যায়নের পক্ষে সম্ভাবনাময় বীজ স্বরূপ। বস্তুত: অস্থিরতাই নাটক সৃষ্টির মৌল প্রেরণা। ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় লেখা ' A tale of two cities 'এর নাট্যরূপ পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই প্রকাশিত হয় এবং বছরের পর বছর অভিনীত হয়। গোর্কি'র 'মাদার' সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। এমন উদাহরণের আর শেষ নেই। আসলে, নাটক বিপ্লবের, আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো শক্তিশালী হাতিয়ার। নাটকের এই অমোঘ শক্তি শিল্পের অন্য কোন মাধ্যমের প্রত্যক্ষত: নেই। সমাজের, রাষ্ট্রের কোন ঘটনাই নাটকে কখনো উপেক্ষিত হতে পারে না।

উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে অস্থিরতা দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে । এই অস্থিরতা মূলত: মুক্তির জন্য অস্থিরতা এবং তা স্বরূপত: ভিন্ন ।

প্রথমত: প্রচলিত প্রথানুগ নাট্যিক অভিনয় ও আঙ্গিক বিন্যাস থেকে মুক্তির বাসনায় অস্থিরতা পঞ্চমাঙ্কের দীর্ঘ বিলম্বিত নাটকের আঙ্গিক ভান্ডারের মধ্যে দিয়ে স্বকীয়তা লাভের জন্য অস্থিরতা ।

দ্বিতীয়ত: তদানীন্তন সরকারের শাসন-পেষণ ও জরুরী অবস্থার বিরোধিতা করবার, শোষণ-পেষণের প্রতিবাদে মুক্তির আকাঙ্খাকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশের অস্থিরতা । ' Man — the world has a proud ring ' — এই মন্ত্রই নাট্যকার ও নাট্যদলকে উদ্বোধিত করে সমস্ত প্রতিকূল শক্তি যা মানবতাকে অবমাননা কবে, তার বিরূদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে । কিন্তু নাটক শিল্প এবং অবশ্যই খাঁটি সাহিত্য । আর রসোত্তীর্ণতাই সাহিত্যের এসিড্ টেস্ট ।

তৃতীয়ত: সত্তর দশকে নক্শাল আন্দোলনের প্লাবন উত্তরবঙ্গের নাটকে অস্থিরতা সৃস্টি করে বটে — তবে নক্শালপন্থী নাট্যদল তা কখনো রূপকের মাধ্যমে, কখনো সরাসরি তাদের নাটককে শ্লোগান সর্বস্ব করে অভিনয় করে ।

চতুর্থত : '৭১ সালের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়বাংলা'র মুক্তিযুদ্ধ উত্তরবঙ্গের সঙ্গে গোটা পশ্চিম বাংলায় অস্থিরতা সৃষ্টি করে । '৭১' এর অস্থিরতার জ্বলন্ত ও জীবন্ত স্বাক্ষর রূপে বর্তমান প্রতিবেদকের সারা উত্তরবাংলা ব্যাপী পথ নাটক এবং মঞ্চ নাটক হিসাবে অভিনীত নাটক ' জাগো বাংলা ' । এই নাট্য-প্রযোজনাটি শতবার অভিনয়ের মর্যাদা লাভ করে ।"

নাট্য-ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থনযোগ্য । ৬০' এর দশক থেকে সত্তর দশকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের নাট্যচর্চার ধারায় প্রতিবাদী নাট্যায়নের যে প্রভাব ঘটেছিল, সেই প্রভাব উত্তরবঙ্গেও বিস্তার লাভ করেছিল । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সত্তরের নকশাল আন্দোলন এবং ৭১' এর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলন । এই অস্থিারতার মধ্যে নাট্য সৃষ্টি এবং মঞ্চাভিনয় থেমে থাকেনি । অস্থিরতাই বিশেষত: সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অস্থিরতা নাট্যধারাকে নতুন খাতে বইতে সাহায্য করে এবং সেক্ষেত্রে অস্থিরতা প্রকৃতপক্ষে নাট্যচর্চার পক্ষে গতিময়তার কাজ করে । এছাড়াও অস্থিরতাই জন্ম দেয় 'conflict' এর, স্থিরতা জন্ম দেয় সমাহিতের — নাটক 'conflict' এর জাতক, সমাহিত প্রজ্ঞার জাতক নয় । সুতরাং অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত সার্থক। অস্থিরতার বাস্তবতা তুলে ধরতে গিয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যে দিকগুলি নির্দেশ করেছেন — পূর্ণাঙ্গ নাটক থেকে একাঙ্ক নাটকে পরিণত হওয়ার প্রবণতা জনিত অস্থিরতা, প্রশাসনিক পেষণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জনিত অস্থিরতা এবং নকশাল-আন্দোলনের পটভূমিকায় সমাজ রাজনৈতিক অস্থিরতা — এর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিত ভূমি জড়িত আবেগের তাড়না-ক্ষুব্ধ অস্থিরতা — এ সমস্ত দিকগুলি সত্য, ইতিহাস-স্বীকৃত এবং এ অস্থিরতার আবর্ত বৃহত্তর বঙ্গ সহ উত্তরবঙ্গেও তৈরী হয়েছে — উত্তরবঙ্গের বুকে প্রশাসনের পুলিশ দাপিয়ে বেড়িয়েছে, নাট্যদলের ভাঙ্গন ঘটেছে — আবার বহু নাট্যদলেরও উদ্ভব ঘটেছে । নাট্য রচনার পথ পাল্টে গেছে , আবার শাসকের পেষণের প্রতিবাদে উত্তরবঙ্গের নাট্যকার মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে ১৫ জুন, ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'West Bengal Dramatic Performances Bill , 1962' বিরূদ্ধে আলোচনা-সম্মেলন হয় । সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ লাহিড়ী, সলিল সেন, সুধী প্রধান, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ নাট্য ব্যক্তিত্ব, লেখক, ব্যবহার জীবী, চলচ্চিত্র-শিল্পী, সমাজ-চিন্তাবিদ্ প্রায় পাঁচশ মানুষ সেই আলোচনা-সম্মেলনে যোগদান করেন । বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বলেন — "পশ্চিমবঙ্গে নাট্যানুষ্ঠান বিল (১৯৬২) পড়িয়া বিচলিত ও বিস্মিত হইলাম । মনে হইল গণতন্ত্রের মুখোশ পরিয়া আমাদের দেশে সম্ভবত: 'ডিক্টেটর শিপ ' ক্রমশ: গদি দখল করিতেছে ।... শিল্পীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের আবহাওয়া আবিল ও বিষাক্ত হইয়া উঠিবে । নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীরা চিরকাল দেশের সুস্থ জনমত গঠন করিয়াছেন, চিরকাল রাজনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদ করিয়াছেন, চিন্ময় সত্যশিব সুন্দরের তাঁহারাই সার্থক বাঙময় উপাসক । তাঁহাদের এ অধিকার বিধিদত্ত । সে অধিকার হরণ করিবার চেষ্টা হাস্যকর এবং দেশের পক্ষে অনিষ্টকর ।" [৭]

প্রশ্ন : উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-সম্পৃক্ত আপনার ভাবনা ব্যক্ত করুন ।

উক্ত প্রশ্ন সাপেক্ষে অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবনা — "জীবন ও সমাজ পরিবর্তমান । ইলেকট্রনিকস

টুকু ছাড়িয়ে বাড়তে পারেনি । সুতরাং বর্তমানের নাট্যচর্চার সৌখীন থিয়েটারের রোগগুলো কিছুমাত্রায় গিয়ে গ্রুপ থিয়েটার, থার্ড থিয়েটারে বাসা বাঁধে, এটি কখনো কখনো নজরে পড়ে ।

এরপরে আসে থার্ড থিয়েটারের কথা । মঞ্চাভিনয়ের সাথে থার্ড থিয়েটারকে জড়িয়ে ফেলা যায়না এ কারণেই যে, মঞ্চ থার্ড থিয়েটারের একটি আবশ্যিক উপকরণ নয় । উত্তরবঙ্গে থার্ড থিয়েটারও খুব বেশি হয়নি । যেটুকু হয়েছে, তাও গ্রুপ থিয়েটারের অনেক কম দর্শকের কাছে পৌঁছেছে । গ্রুপ থিয়েটারই এক্ষেত্রে বেশি সক্রিয় এবং এক্ষেত্রে জনপ্রিয় কয়েকটি নাটকের নাম উত্তরবঙ্গের দর্শকেরা উল্লেখ করে থাকেন । এর মধ্যে কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধের এল্ সালভাদর, গন্তব্য, ঝড়ের খেয়া, সেথুয়া, বর্ণনার দিনগত, হ্যামলিনের বাঁশী, থিয়েটার ইউনিটের ঠিকঠিক বাবা, শব বাহকেরা, সাজানো বাগান, সপ্তর্ষির জন হেনরী, মাথাভাঙ্গার গিলোটিন এর টাপুর-টুপুর, দিনহাটা প্রগতি নাট্যসংস্থা'র আলিবাবা পাঁচালী, রায়গঞ্জের ছন্দমের ফুলমোতিয়া, শিলিগুড়ি দামামা'র তাজমহল, কুড়ানি, বালুরঘাট ত্রিতীর্থের দেবীগর্জন, জল প্রভৃতি নাটকের নাম অনেকেই বলেন ।

সাধারণ দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য গ্রুপ থিয়েটারের সক্রিয়তার প্রথম কারণ আদর্শ । প্রায় প্রতিটি গ্রুপ থিয়েটার তাদের ঘোষিত আদর্শ হিসাবে মানব কল্যাণকে বেছে নিয়েছেন । শুধু এই উদ্দেশ্যেই তারা বেশি বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চান । উত্তরবঙ্গের গ্রুপগুলোও এর ব্যতিক্রম নয় । একইভাবে দর্শকেরাও এদের কাছ থেকে পান জীবনকে দেখার একটি আয়না । এই আয়নায় জীবনের আরো গভীর পরিচয় তাদের কাছে পরিস্ফুট হয় । থিয়েটার গ্রুপগুলি নাটকের বিজ্ঞানকে যথাসাধ্য আয়ত্ত করে পরিকল্পিত পরিশ্রম করেন বলে মঞ্চাভিনয়কে দর্শক হৃদয়ে প্রবিষ্ট করতে একটু বেশি সফল মনোরথ হন ।"

নট-নাট্য ব্যক্তিত্ব দীপায়ন ভট্টাচার্যের অভিমত অংশত: সত্য বিশেষত: হাল আমলের উত্তরবঙ্গের নাট্য জগতে । তবে ৭০ এর দশক পর্য্যন্ত উক্ত ভট্টাচার্যের গ্রুপথিয়েটার সংস্থা উত্তরবঙ্গে কড়ের আঙ্গুলে গনা যায় এমন দু/একটি ছিল। সেক্ষেত্রে ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত প্রায় একশ বছর ধরে সৌখীন থিয়েটার উত্তরবঙ্গে নাট্য-সংস্কৃতিকে ধারণ এবং পোষণ করে চলেছে । সমগ্র উত্তরবঙ্গ ব্যাপী প্রায় দেড় শতাধিক সৌখীন নাট্যসংস্থা (চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) অসংখ্য নাট্য-প্রযোজনা করেছে । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৌখীন নাট্যসংস্থা বি.দে. ড্রামাটিক হল, (বর্তমান মালদহ ড্রামাটিক ক্লাব) বালুরঘাটের নাট্যমন্দির, রায়গঞ্জের থিয়েটার সেন্টার, শিলিগুড়ির মিত্র সম্মিলনী, জলপাইগুড়ি আর্যনাট্যসমাজ, বান্ধব নাট্যসমাজ, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ী ড্রামাটিক ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংঘ, স্টেট্ ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, দিনহাটার পাইওনীয়র ক্লাব, মেখলীগঞ্জের মনমোহন নাট্যমঞ্চ প্রভৃতি । এই সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলি থেকেই অর্থাৎ সৌখীন নাট্যসংস্থাগুলির প্রেরণা-স্পন্দনে উত্তরবঙ্গের মঞ্চাভিনয়ে গ্রুপথিয়েটার, থার্ড থিয়েটারের আবির্ভাব। সুতরাং গ্রুপ থিয়েটার, থার্ড থিয়েটার, সার্কেল থিয়েটার, মুক্তমঞ্চ অর্থাৎ নব পরিচিত যে কোন নাট্য ফর্মের জমি এবং সেই জমি চাষের উপযোগী কিনা — তা বিচার করবার মতো দর্শক-খদ্দেরের ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রস্তুত করেছে নাট্যরস পিপাসু উত্তরবঙ্গের সৌখীন নাট্যব্যক্তিত্বের মানুষেরা । তাদের ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং নিষ্ঠা এ ব্যাপারে স্মরণীয় না হলে ঐতিহ্যের অবমাননা করা হবে । শখ, শৌখীনতা কোনো বিচ্ছিন্ন, খন্ড কালের মানসিকতা নয় — অনন্তকালের মানসিকতা । সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই এর সম্ভাবনা সম্ভূত । তাই হাল আমলে অর্থাৎ ৭০ এর দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটার সংস্থার রমরমে অবস্থার মধ্যেও মিত্র সম্মিলনী, নাট্যমন্দির, আর্যনাট্যসমাজ কিন্তু মুছে যায়নি । তবে নাট্য বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রুপথিয়েটারে যতটা সক্রিয়, যতটা ব্যাপক — এ ছাড়াও দর্শকের শ্রেণী বিশ্লেষণ এখানে যে আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার্য হয় এবং সে অনুপাতে 'পারম্যুটেশন এবং কম্বিনেশন' করে নাট্য-প্রযোজনার হিসেব-নিকেশের পরিকল্পায়ন ঘটে — সৌখীন থিয়েটারে তা ঘটে না । এক্ষেত্রে শ্রী ভট্টাচার্যের অভিমত সমর্থনযোগ্য। এছাড়া থার্ড থিয়েটারের বিস্তৃতি উত্তরবঙ্গে এখনও সার্থক লক্ষণীয় হয়নি — শ্রী ভট্টাচার্যের এই মতটিও গ্রহণযোগ্য ।

প্রশ্ন : উত্তরবঙ্গের নাট্যসাহিত্যে মন্মথরায় এবং তুলসী লাহিড়ী'র পরবর্তী এমন কোন নাট্য-প্রচেষ্টা শিল্পিত মান লাভ করেনি কেন ?

এই প্রশ্নটির উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলার নাট্যব্যক্তিত্ব ড: সমীর চক্রবর্তী বলেছেন — " রবীন্দ্র নাথের পর বাঙলা সাহিত্যে কোনো উচ্চ মানের নাটক রচিত হয়নি । তবে নাটক লিখিত হয়েছে এবং মঞ্চে তা সমাদরও হয়েছে। উত্তরবঙ্গের নাট্য প্রচেষ্টা শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে কি হয়নি— এ বিষয়ে চট জলদি কিছু বলা সম্ভব নয়। কেননা স্থানীয় ভাবে বিভিন্ন জেলায় অনেক নাটক লেখা হয়েছে, মঞ্চে অভিনীতও হয়েছে, কিন্তু কখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

কারণ, অতীতের কথা ছেড়ে দিন, এখনো উত্তরবঙ্গে কোনো প্রকাশনা শিল্প গড়ে ওঠেনি। নাটক পাঠ করে আনন্দ পান, এরকম লোকের সংখ্যা সর্বত্রই কম । এছাড়া অনেক নাট্যকার নিজ গোষ্ঠীর অভিনয়ের জন্য নাটক লিখেছেন। সে সবের মঞ্চায়ন প্রশংসিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি । যেমন পঞ্চাশের দশকে জলপাইগুড়ি শহরে রবি ঘোষ খুব ভালো নাটক লিখতেন । তাঁর লেখা নাটকে আমি নিজেও অভিনয় করেছি । সে সব রচনার মান যথেষ্ট বা সর্বোত্তম না হলেও নিকৃষ্ট ছিল না — একথা বলতে পারি । তা সে সব তো আর ছাপা হয়নি । উত্তরবঙ্গে প্রায় সব জেলা শহরে বা মহকুমা শহরে এমন এক-আধজন নাট্যকার নিশ্চয়ই ছিলেন এবং আছেনও । তাদের রচনা না পড়ে কি ভাবে অভিমত তুলে ধরবো ? অমিয় ভূষণ মজুমদারও নাটক লিখেছেন । কিন্তু পাচ্ছি কই ।"

ড: সমীর চক্রবর্তীর অবধারণ যুক্তিযুক্ত । উত্তরবঙ্গের নাট্যকার মন্মথ রায় এবং তুলসী লাহিড়ী'র নাটকগুলি কলকাতার প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষকতা লাভে ধন্য হয়ে গ্রন্থাকারে পাঠকের দরবারে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে । কিন্তু সে সময়কালীন এবং তার পরবর্তী উত্তরবঙ্গের অনেক নাট্যকারের মৌলিক বা রূপান্তরিত নাটক প্রকাশনার সৌভাগ্য লাভ করেনি এবং দু/একটি সে সৌভাগ্য লাভ করলেও মঞ্চায়নে খ্যাতির শিখরে পৌঁছে কলকাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি । ফলে সেগুলি কালের কপোলতলে বিস্মৃতির স্তূপীকৃত রাশি হয়ে পাঠক-দর্শকের অগোচরে থেকে গেছে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে বিশেষ কোনো স্থায়ী নাট্য-পত্রিকাও নেই, যাতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাট্যকারদের নাট্যপ্রয়াসের তথ্য প্রকাশিত হতে পারে । কাজেই সেক্ষেত্রে মন্মথ রায় এবং তুলসী লাহিড়ী'র সমসাময়িক নাট্যকার এবং তার পরবর্তী নাট্যকারদের নাট্য-প্রচেষ্টাগুলির শিল্পিত মান মূল্যায়ন করার কোন সুযোগই নেই । তবে ড: চক্রবর্তীর এরূপ ঋণাত্মক ভঙ্গি সর্বস্ব জবানীতে আংশিক হলেও কিছুটা অসত্য রয়েছে । উত্তরবঙ্গের নাট্যব্যক্তিত্বদের পক্ষে এটি লজ্জা এই কারণে যে তাঁরা নিজেরাও এ সমস্ত নাট্যরচনা এবং মঞ্চাভিনয় প্রভৃতি ঐচ্ছিক অথচ নন্দন কলাযুক্ত ব্যাপারগুলির প্রতি শৃঙ্খলা মাফিক মনোযোগী নন । তা না হলে মন্মথ রায় কে জানলাম, আর ওরই সমসাময়িক শিবপ্রসাদ করকে জানবো না, জলপাইগুড়িতে বসে তুলসী লাহিড়ী'র লেখা দু:খীর ইমান জানবো, আর সুরজিৎ বসু, ভূপেন্দ্র কিশোর সরকার কে জানবো না — এ হতে পারে না । নাট্য-মানসিকতার ব্যক্তি হয়ে ছেঁড়া তার পড়বো, অভিনয় দেখবো, মূল্যায়ন করবো — আর রঙপুরের নবাব নূরল উদ্দীনের কৃষক বিদ্রোহ নিয়ে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক সংঘের প্রযোজনায় 'নবাব নূরল উদ্দীন ' দেখব না, জানবো না — এ একরকমের সাময়িক উন্নাসিকতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা । সুতরাং এটি স্পষ্ট যে উত্তরবঙ্গ চিরায়ত কাল থেকে নাট্যরসিক হলেও ঘর গোছানোর ব্যাপারে নাট্যকার, নট এবং নাট্যামোদী ব্যক্তিত্ব এই এয়ী'র মধ্যে উত্তরবঙ্গে পারস্পরিক বোঝা পড়ার অভাব ছিল এবং সে কারণেই মন্মথ রায়, তুলসী লাহিড়ী-পরবর্তী নাট্য-সৃষ্টির কোনো রকমের মূল্যায়ন হয়নি।

প্রশ্ন : উত্তরবঙ্গ অসংখ্য চা-বাগিচা এবং চা শ্রমিকের প্রতিদিনকার পারস্পরিক সাহচর্যের নৈসর্গিক এবং ভাবভিত্তিক রূপকার — তবুও শতবর্ষের আলোকে চা-জীবন সম্পর্কিত কোনো নাট্যিক প্রয়াস উত্তরবঙ্গের জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেনি কেন ?

এই প্রশ্নটিও উক্ত ড: সমীর চক্রবর্তীর কাছে রাখা হয়েছিল । ড: চক্রবর্তী যে উত্তরটি লিখে পাঠান , তা নিম্নরূপ— " এখানেও আমি একই কথার পুনরাবৃত্তি করছি । নাট্যিক প্রয়াস সম্পর্কে সেরকম অন্বেষণ বা সমীক্ষা তো করা হয়নি । চোখের আড়ালে কত ফুল ঝরে গেছে — কে তার খবর রাখে !

এছাড়া , শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবির সংখ্যা উত্তরবঙ্গে বরাবরই কম । ইদানীং স্কুল-কলেজ বেড়েছে । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তবু একটাই আছে । দেশ ভাগের পর আসা উদ্বাস্তুর ঢল উত্তরবঙ্গকে তোলপাড় করেছে । সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিচলিত হয়েছে । কুরুখভাষী চা শ্রমিকদের একটি ছড়ায় আছে ' চি পাপা নু গাড্ডি ' — 'চাঁদ তুই রুটি দে ' । একটি সাদরি ছড়ায় আছে — " নিমফুলা গোটাইয়া পওয়া লেইকে ফুলেলা " — নিমফুলের গোটা পাউরুটির মত ফুটে উঠেছে ।

উদ্বাস্তু সন্তানদেরও 'চাঁদ' আর 'ফুল' দেখে পাউরুটির কথাই মনে পড়েছে । শিল্পের বিষয়টি মাথায় আসেনি হয়তো ।

আসলে প্রসব করার মত জননী, ধারণ করার মত জরায়ু, বহন করার মত আঁতুড় ঘর আর লালন করার মত ধাত্রী, কিছুই ছিল না যে । নাটক আসবে কোথা থেকে ? দেশভাগ নিয়েই তো একটা এপিক উপন্যাস লেখা যেত । লেখা কি হয়েছে ? অস্থিরতার মধ্যে বোধ হয় মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না । টেথিস সমুদ্র থেকে এই তো উঠে আসা ।

সকালের ঘুম ভাঙার ঘোর যে এখনো কাটেনি আমাদের ।"

শতাধিক বছরের প্রাচীন উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচা অধ্যুষিত জনজীবন । উত্তরবঙ্গের চোমাং লামা এই জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন । সনৎ চ্যাটার্জীও এই জীবনের চলার ছন্দ অনুধাবন করেন । তবে এদের এই প্রয়াস সাম্প্রতিক কালের । এই প্রয়াসের মধ্যে উক্ত জনজীবনের নাট্যবয়ন ঘটেনি । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বর্গ, শ্রেণীর মানুষ, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাভাষীর মানুষ এখানে বর্ণনিবিড় জীবনস্রোতের সামিল হয়েছেন । তাদের দেশজ লোকাচার স্থানীয় নৈসর্গিক কারুকলা সম্পর্কিত লোকচারের সঙ্গে মিশে গিয়ে বিচিত্র জীবনাচারের বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে । এদের ' রিচ্যুয়ালস্' এদের প্রাচীন কৌম-আচারের বিবর্তিত রূপ । বিভিন্ন লৌকিক অনুষ্ঠানে নৃত্য গীতের মাধ্যমে এদের 'রিচ্যুয়ালস্' আত্মপ্রকাশ করে । সুতরাং চা বাগিচা-জীবনের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্য বিত্ত মানসিকতার নিবিড় যোগ থাকলে হয়তো এ জীবনের উত্থান-পতন নিয়ে আমরা কোনো সামাজিক নাটকের সন্ধান পেতাম । সুতরাং ড: চক্রবর্তীর অভিমত এক্ষেত্রে সমর্থন যোগ্য ।

তদুপরি দেশভাগের বিধ্বস্ত মানবিকতার ফসিল নিয়ে পূর্ববঙ্গের আলোকিত মানব-মনের ঘর গড়ার পালা উত্তরবঙ্গে শুরু হয় — তাদের কাছ থেকে নাটক কেন, কোনো কলা-সৃষ্টির আশা করা বৃথা । সুতরাং দেশভাগ উত্তরবঙ্গের প্রাত্যহিক জীবনধারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই অস্থির সামাজিকতার পটভূমিকায় চা-বাগিচার প্রাচীন অস্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত জনজীবন আলোকিত-উদ্বাস্তু জীবনে বিস্ময় জাগালেও তাদের নিয়ে শিল্পিত চেতনার কোনো বিকাশ তাদের মধ্যে ঘটেনি, ঘটা সম্ভবও নয়। সুতরাং এদিক থেকেও ড: চক্রবর্তীর মত গ্রহণযোগ্য।

এছাড়াও, চা-বাগান গুলিতে প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় ছিলেন ইংরেজ-প্রভুরা — পরবর্তীকালে পুঁজির কলজে সর্বস্ব ব্যবসায়ীরা ছিলেন । তাদের দয়া-নির্দিষ্ট মজুরিতে চা-জনজীবনের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অসহায় । শিক্ষার সংস্পর্শ সাধারণ-জীবনের পক্ষে শোভনীয় ছিলনা — তা কেবল উপরি কাঠামোর বাবুশ্রেণীভুক্ত মানুষের । সুতরাং একদিকে অর্থনৈতিক ' exploitation ', অন্যদিকে নিজেকে জানাবার বোঝাবার জন্য ন্যূনতম যে শিক্ষা, তা থেকে বিচ্ছিন্ন — সে জীবনপটে নন্দন কলার ভাবনা জাগতেই পারেনা । কাজেই ড: চক্রবর্তীর উক্ত জীবনায়ন সম্পর্কে নাট্যিক প্রয়াসের অনুধ্যান যথাযথ ।

প্রশ্ন : *তে ভাগা আন্দোলন, সন্ন্যাস বিদ্রোহ — এ কালের নক্সাল আন্দোলন এ সকলের উৎসভূমি উত্তরবঙ্গ কেন আন্দোলনমুখী নাটকের প্রকাশ ঘটাতে পারেনি ?*

এই প্রশ্নটির উত্তরে ড: চক্রবর্তী বলেন — " সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কোনো সমাজ শিকড় ছিলনা উত্তরবঙ্গের মাটিতে । তেভাগা আন্দোলন ও নক্সাল আন্দোলন স্ফুলিংগ মাত্র । উত্তবরঙ্গের মাটিতে তা থেকে দাবানলের জন্ম হয়নি । এই আন্দোলনগুলি পৌরুষদীপ্ত আবেগে তাড়িত হয়েছে, আত্মাহুতির বন্যা বয়ে গেছে । এই ত্যাগ ও মহত্বের কোনো তুলনা নেই । কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ যুদ্ধে পরিণত হতে পারেনি । আন্দোলনগুলি অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল । মূল নেতৃত্বে কৃষক ছিল না । ছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবি যাদের ব্যাপক অংশ অনভিজ্ঞ তরুণ । তারা ডি-ক্লাসড্ হতে পারে নি । অবজেকটিভ রিয়ালিটি সম্পর্কে প্রখর বোধ তারা অর্জন করতে পারেনি । শাসক চরিত্র ও কৃষক চরিত্র, বিপ্লবের স্তর, জনগণের মধ্যেকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব — এ সব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তাদের ছিল না । তারা স্থিতাবস্থাকে, সমাজব্যবস্থাকে বদলাতে চেয়ে ছিল । সুন্দর এক নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল । কিন্তু সেই আন্দোলন এপিক -পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি । প্রতিবাদী আন্দোলনে মহাকাব্যিক মাত্রা যুক্ত না হলে তা থেকে সার্থক শিল্প বেরিয়ে আসতে পারে না। স্ফুলিঙ্গের ঝলক আর দাবানলের দ্যুতি এক নয় । তেভাগা ও নক্সাল আন্দোলনের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল (যদিও খতমের রাজনীতি সম্পর্কে আমি দ্বিমত পোষণ করি), তবু বলতে হয় তা নাট্যরচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারেনি। শুধু নক্সাল কেন, সমগ্র বামপন্থী আন্দোলন যে নাটক প্রসব করেছে, তা আসলে দোলাচল ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের ক্যাথারসিস বা বিরেচন প্রক্রিয়া মাত্র, এক কথায় পার্গেটিভ বটিকা । "

সন্ন্যাস বিদ্রোহের শিকড় বস্তুত:ই উত্তরবঙ্গের মাটিজ নয় । তাই এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের নাড়ীর সম্পর্ক ছিল না । সে কারণে এর দ্যুতি একান্তই অন্ত:সারশূন্য । এ থেকে নাট্যভাবনার দ্যোতনা ঘটতে পারে না ।

তবে তেভাগা আন্দোলন উত্তরবঙ্গের খাপুড়ে, বালুরঘাটে বেশ জমাট বেঁধেছিল । প্রশাসনের টনক নড়েছিল। সাধারণ মানুষের একটি সুদৃঢ় সংগঠনও দানা বেঁধেছিল । জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে এই সংগঠনটি একটি শ্রেণী-ভাবনারও জন্ম দিয়েছিল। তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং বিত্তবান ধনিক সমাজ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল এবং ধনিক সমাজ

তো প্রশাসনের সহায়তায় বিশেষ সক্রিয় ছিল ।

তবে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ জীবনস্তরের মানুষ তাদের বাঁচার তাগিদে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, সেহেতু নিছক আন্দোলনের উদ্দেশ্যেই আন্দোলন নয় — এর মধ্যে আদর্শবোধ কাজ করেছিল । একদিকে আদর্শ, অপর দিকে আদর্শহীন প্রশাসন — এ দুয়ের সংঘর্ষ নাট্যরূপের সৃষ্টি ঘটাতে পারতো । সাম্প্রতিক কালে বালুরঘাটের হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তেভাগা'র পটভূমিকা নিয়ে ' মন্ত্রশক্তি ' নাটক লিখেছেন এবং নাটকটি মঞ্চসফলতাও লাভ করেছে , তবে দর্শক-পাঠক মনে উদ্দীপনের সাড়া জাগাতে পারেনি ।

উত্তরবঙ্গের নক্সাল আন্দোলন নিয়ে উৎপল দত্ত ' তীর' নাটকটি লিখেছেন এবং স্থানীয় নাট্যব্যক্তিত্বদের এই আন্দোলন নিয়ে নাট্যপ্রয়াস চালানোর মতো অবস্থা হয়নি দেখে উৎপল দত্ত ধিক্কার জানিয়েছেন । সুতরাং প্রয়াস থাকলে নক্সাল আন্দোলন নিয়ে বা যে কোনো আন্দোলনের পটভূমিকা নিয়ে নাটক লেখা যায় । অত্যাচারিত গণমানুষ যেহেতু আন্দোলনের মুখ্য উপাদান, সেহেতু এদের সমাজ রাজনীতিকতার ভাবনা নিয়ে ভাবনার এপিক রূপ দান করা সম্ভব । সুতরাং ৭০ এর নক্সাল আন্দোলন নিঃসন্দেহে নাট্যবিষয় হতে পারতো — হয়নি । 'মুখ্যমন্ত্রী', 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' যদি ক্লাসিক নাটক হতে পারে — তবে উত্তরবঙ্গের সমাজ-মানসিকতায় নক্সাল আন্দোলন অন্য আর একটি ক্লাসিক শ্রেণীর নাটকের জন্ম দিতে পার তো — পারেনি যে, তার দায়ভাগ উত্তরবঙ্গের স্থানীয় নাট্যকারদের বহন করতে হবে, নাট্যব্যক্তিত্বদের গ্রহণ করতে হবে ।

সুতরাং ড: চক্রবর্তীর অভিমত অংশত: গ্রাহ্য হলেও সামাগ্রিক ভাবে গ্রাহ্য হতে পারে না । বিশেষত: সামাজিক ঘটনাবর্তই যেহেতু নাট্য আবর্তের সৃষ্টি করে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূক্ষ্ম জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে — সে কারণ নক্সাল আন্দোলনের তত্ত্ব এবং প্রয়োগের মধ্যে কোথায় দর্শন, কোথায় exploitation , কোথায় বস্তু-দ্বান্দ্বিকতা — এ সমস্ত কিছুই যথার্থ নাট্য-প্রয়াসের সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে পারতো এবং এই একই কথা তেভাগা আন্দোলনের পক্ষেও বোধ হয় খাটে ।

প্রশ্ন : জলপাইগুড়ি জেলায় শৌখিন নাট্যচর্চা গণমুখী হতে পেরেছিলো কি ?

এই প্রশ্নটি জলপাইগুড়ি, আলিপুর দুয়ার মহকুমা'র নাট্য ব্যক্তিত্ব কিশোর পাইনের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল । শ্রী পাইন মহাশয় এর উত্তরে বলেছেন — " উত্তরবঙ্গের একটি জেলা জলপাইগুড়ি। পাহাড়, অরণ্য, চা-বাগিচা, নদী প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈচিত্রে বিচিত্র রূপ মন্ডিত । এর জনবসতিও বিচিত্র । নানা ভাষা, উপভাষাভাষী মানুষ, পূর্বতন বাসিন্দা প্রভৃতি নিয়ে এর জনপদ-জীবন, নগর-নগরায়ন । দেশভাগ হয়ে পূর্বতন পূর্ববাংলার মানুষের বসবাস, বৃটিশ-শাসনকালে ব্রিটিশ-পরিচালিত চা বাগানগুলিতে দূর দেশ আগত চা-শ্রমিকের বসবাসও এখানে । ছোটনাগপুর, রাঁচি, বিহার, লোহার দাগা, সাঁওতাল পরগণা থেকে আগত শ্রমজীবী মানুষ এখানে স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছে । এখানকার আদিবাসিন্দা রাজবংশী, রাভা, বোড়ো, টোটো এবং পাহাড়ী বাসিন্দা নেপালী, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি। রেল চাকুরেদের কলোনি, বন-ব্যবসায়ী, চা-বাগিচার চা-বাবু, বন-কর্মচারী, শিক্ষক, অফিস-আদালত-কর্মী প্রভৃতি নিয়ে মান্য মানুষের বসতি । এদের নিয়ে উপরি কাঠামোর সমাজ । এই সমাজ নিয়েই নাগরিক সমাজ । অন্যদিকে চা-শ্রমিক, রাজবংশী, লেপচা, গারো, রাভা প্রভৃতি নিয়ে লোক সমাজ। এই দুই ভিন্ন সমাজের সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র — একটি হল নাগরিক মান্য সংস্কৃতি, অপরটি লোকজীবন কর্মসংস্কৃতি ।

মান্য মানুষ মনের তাগিদে গড়ে শৌখিন নাট্যদল । মানুষের মানসিক বিনোদনে নাটক বিংশশতাব্দির গোড়ার দিকে একটি বিশিষ্ট মাধ্যম ছিল । নাটকের কাহিনী কালোচিত এবং আবেদন গত ভাবে নিবিড় । পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, দেশপ্রেম প্রভৃতি নিয়ে সে সময়ের নাট্যবন্ধন । তবে মান্য সংস্কৃতির সৌখিন নাট্য-প্রয়াস গণমুখী হতে পারেনি । শৌখিন নাট্যসংস্থা গড়ে ওঠে মান্যব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়, দর্শকও মান্যসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক — লোকজীবন কর্মসংস্কৃতি এ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবনের বৃত্তায়নে আবদ্ধ । এছাড়া মঞ্চাভিনয় বুঝতে যতটুকু শিক্ষিত পটু মানসিকতার প্রয়োজন, বৃহত্তর গণ জীবনের মধ্যে তার অভাব ছিল । তারা তাদের নাট্যরস চরিতার্থ করতো তাদের লোকায়ত নৃত্যগীত-অনুষ্ঠানের মধ্যে । কাজেই সে সময়ের শৌখিন নাট্যচর্চা মান্যসংস্কৃতির সীমিত অঙ্গনেই বৃদ্ধি ও পুষ্টির পথ খুঁজে চলছিল ।" নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী পাইনের বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ উত্তরটি সমর্থন যোগ্য । জলপাইগুড়ি কেন, সমস্ত উত্তরবঙ্গে যে শৌখীন নাট্যচর্চাকে কেন্দ্র করে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের বিস্তৃতি ঘটে — সেই থিয়েটারের অঙ্গন গণমানুষের কাছে একেবারেই অপরিচিত ছিল । যেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত নাটপালা

অনুষ্ঠিত হতো, সেই অঙ্গনে আড়াই থকে তিনঘন্টা (পূর্ণাঙ্গ নাটকের ক্ষেত্রে) পর্য্যন্ত অভিনয়, তার উপর সংক্ষিপ্ত সংলাপের ঝড়, স্তিমিত হাসি, পরিমিত বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, মঞ্চের তিনদিক বন্ধ, এক দিক খোলা, বারবার দৃশ্য পরিবর্তন প্রভৃতি বিরাম, যতি সম্বলিত অভিনয়ের একটি পরিমিত রূপ সাধারণ দর্শককে আকর্ষণ করতে পারোনি । তাই শৌখিন নাট্যাঙ্গন সীমিত দর্শক-চিত্তের আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম হয়েছিল — গণচিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হয়নি।

প্রশ্ন : উত্তরবঙ্গে ৭০ এর দশক থেকে যে গ্রুপ থিয়েটার-সংস্থাগুলি নাট্য-প্রযোজনা করে চলেছে, সে প্রযোজনাগুলি কি আপনার মতে রসোত্তীর্ণ হয়েছে ?

উদ্ধৃত প্রশ্নটির উত্তরে জলপাইগুড়ি'র নাট্যব্যক্তিত্ব অনিমেষ ঘোষ মন্তব্য করেন — " বিশেষ দু/একটি গ্রুপ থিয়েটার ছাড়া আর অন্যান্য অসংখ্য গ্রুপ থিয়েটার-প্রযোজনা রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি বলে মনে করি । ৭০'এর প্রথম দিকে গ্রুপ থিয়েটারের নাট্য-প্রযোজনাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাততাড়াতাড়ি নাট্যায়নকে গণমুখী করা — সেক্ষেত্রে নাটকের প্লট বা কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ প্রভৃতি দিক থেকে নাট্যকারের দৃষ্টি প্রধানভাবে প্রোথিত হতো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বক্তব্য কে দর্শকের সামনে তুলে ধরা । সংলাপ সেক্ষেত্রে শ্লোগান সর্বস্ব হয়ে উঠতো, নাট্যরসের বিস্তৃতিও বিঘ্নিত হতো । অবশ্য এক্ষেত্রে বালুরঘাট ত্রিতীর্থের দেবাংশী, শিলিগুড়ি দামামা'র কুড়ানি, দিনহাটা প্রগতি'র নিহত আদম সন্তান রসোত্তীর্ণ হয় এবং উত্তরবঙ্গ কেন, বৃহত্তর বঙ্গের দর্শক সমাজেও সমাদৃত হয় ।"

প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব অনিমেষ ঘোষের মন্তব্য অংশত: যুক্তিগ্রাহ্য । বক্তব্য-প্রধান নাট্য-প্রযোজনার অস্তিত্ব সকল শ্রেণীর দর্শকের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারেনা । অবস্থার পরিবর্তনে রাজনৈতিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটে, সমাজ-মানসিকতারও পরিবর্তন ঘটে । তাই সময়ের পরিবর্তনশীলতাকে অস্বীকার করে, পাঠক-দর্শকের রুচিগত মানের বিবর্তন উপেক্ষা করে নাট্যপ্রয়াসকে স্থানিক এবং নির্দ্ধারিত তত্ব মাফিক করে তোলা হলে নাটকের নান্দনিকতা ক্ষুণ্ণ হয়, প্রযোজনাটি ক্ষণজীবী হয় — রসোত্তীর্ণ হতেই পারে না । তবে গ্রুপ থিয়েটারের মাধ্যমে নিয়মিত নাট্যপ্রয়াসের অনুশীলন নির্দিষ্ট হয়েছে, নাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, ওয়ার্কশপ ট্রেনিং হচ্ছে, পরিচালনগত উন্নয়ন ঘটছে — নাটকের এ দিকগুলি নাট্যরসের স্ফুরণ ঘটাতেই সাহায্য করে । সেক্ষেত্রে বক্তব্য-প্রধান নাটকের মধ্যে অনেক সময় সারস্বত মানবিকতার রূপটি ফুটে ওঠে এবং প্রযোজনাটি রসোত্তীর্ণ হতে পারে । বালুরঘাট নাট্যতীর্থের প্রযোজনা ' খারিজ ' একটি স্থানিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য কেন্দ্রিক নাট্যপ্রয়াস হলেও অনুশীলিত প্রযোজনার গুণে নাটকটির বক্তব্য কালোত্তীর্ণ হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে প্রযোজনাটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে ।

প্রশ্ন : ৬০ এর দশক পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ির আর্য্যনাট্যসমাজ এবং বান্ধবনাট্যসমাজ যে শৌখীন নাট্যচর্চার সাড়া জাগিয়েছিল, তা এখন স্তিমিত কেন ?

এই প্রশ্নটির উপস্থাপনা করা হয়েছিল জলপাইগুড়ির নট, নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক কুমারেশ দেবের কাছে । এই প্রশ্নটির উত্তরে শ্রী দেব জানিয়েছেন — " একটি সংস্থা ষোল কলায় পূর্ণ হলে তাতে আসে ভাঙ্গন । বয়সের সাথে সাথে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অবসর, কারো বা স্থানান্তরে গমন প্রভৃতি ঘটে । সে শূন্য স্থান পূরণ হয়না। উপরন্তু যে শৌখীন নাট্যব্যক্তিত্বের প্রাধান্যে মূলত: সংস্থার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ঘটে, সেরূপ ব্যক্তিত্বের অভাব দেখা যায় পরবর্তীকালে। এছাড়াও নাট্যসংস্থাগুলি তাদের উত্তরাধিকার পারম্পর্য করতে কোনো শিশু-নাট্যসংস্থা গড়ে তোলারও প্রচেষ্টা করেনা। এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় দলগুলি ভেঙ্গে নতুন নতুন নাট্যদল গড়ে ওঠে । শীর্ষস্থানীয় নাট্যসংস্থাগুলি পূর্বতন ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে কোনোমতে অস্তিত্ব রাখার চেষ্টা করে । জলপাইগুড়ি'র শীর্ষস্থানীয় নাট্যসংস্থা আর্য্যনাট্যসমাজ এবং বান্ধব নাট্যসমাজের নাট্য-প্রযোজনার স্তিমিত গতির পিছনে এই কারণগুলি বর্তমান এবং সে কারণে এই শীর্ষস্থানীয় শৌখীন নাট্যদলগুলির নাট্য-প্রযোজনা বর্তমানে স্তিমিত।"

শ্রী দেবের বিশ্লেষণ উক্ত প্রশ্ন সাপেক্ষে সমর্থনযোগ্য । জলপাইগুড়ি'র আর্যনাট্যসমাজ (১৯০৪ খ্রী:), বান্ধব নাট্যসমাজ (১৯২৪ খ্রী:) — এই সংস্থা দুটি ষাটের দশক পর্য্যন্ত একাদি ক্রমে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক নাটকের অসংখ্য প্রযোজনা করে। কিন্তু এর পরবর্তীতে এদের নাট্যচর্চা জলপাইগুড়িতে একেবারে স্তিমিত — সে তুলনায় ৭০ এর গ্রুপ থিয়েটার-সংস্থাগুলি জলপাইগুড়ি'র নাট্যচর্চাকে (মঞ্চাভিনয়) এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মৌচাক, প্রগতি, শিল্পী সংসদ, কলাকুশলী, শিলালী, মুখোস, অন্বেষা, সুকৃষ্টি, অবশেষে, শৈলূষ, সংহতি প্রভৃতি গ্রুপ থিয়েটার-সংস্থা বর্তমানে বিশেষ সক্রিয় । যদিও পূর্বতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে আর্য্যনাট্যসমাজের নাট্য-প্রযোজনা 'নোনাজল' (মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা) ১৯৮৫ খ্রী: সারাবাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ তাদের নাট্যচর্চার ঐতিহ্য রক্ষার সাক্ষ্য দেয় এবং বান্ধব

নাট্যসমাজেরও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাকালীর বাচ্চা' নাট্য-প্রযোজনাটির মাধ্যমে ১৯৮৭ খ্রী: নাট্য-প্রতিযোগিতায় সম্মান-স্বীকৃতি লাভ সেই একই উদ্দেশ্যের স্বীকৃতি দাবি করে।[৮]

তবে শৌখীন নাট্যসংস্থার উন্মেষ ঘটে বিশেষ নাট্যামোদী ব্যক্তিত্বের সক্রিয় সাহচর্য্যে। আর্থ-সামাজিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সেরূপ ব্যক্তিমানসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর্য্যনাট্যসমাজ এবং বান্ধব নাট্যসমাজের ক্ষেত্রে সেরূপ ঘটনাই ঘটেছে। এর ফলে বহু ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গ্রুপথিয়েটার-সংস্থার আবির্ভাব হয়েছে। নাট্য-মাদকীয়তা বাঙালীর স্বভাব জাত ; সে তো বন্ধ্যা হয়ে থাকতে পারেনা। প্রয়োগের মঞ্চ-ব্যবস্থা ভিন্ন হতে পারে। তাই শৌখীন নাট্য-প্রয়াস জলপাইগুড়িতে আজ স্তিমিত।

প্রশ্ন: প্রসেনিয়াম থিয়েটার-মঞ্চের নাটক এখনও মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের দর্শক স্থান ছাপিয়ে লোক সাধারণের কাছে পৌঁছুতে পারেনি কেন ?

জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব বিনায়ক দেবের কাছে এই প্রশ্নটি রাখা হয়েছিল। প্রশ্নটির উত্তরে উক্ত দেব মন্তব্য করেন — "প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে নাটকের প্রয়োগের দিক। নাটক যেহেতু 'Performing Art', সেহেতু নাটকের এই প্রায়োগিক প্রশ্নটি নিশ্চয়ই আলোচনার দাবী রাখে। তত্ব এবং তার্কিকতার দিক থেকে আমার কিন্তু 'নবান্ন' দিয়ে গণ-দর্শকের পূজা করেছি। তারপর দুঃখীর ইমান, ছেঁড়াতার, পথিক প্রভৃতি দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের যে ব্যবস্থা করেছি — তাও তো লোকসাধারণের জন্য। I. P. T. A. — সে তো লোক চরিত্র, লোক দর্শক মঞ্চের মধ্যে নিয়ে আসার সার্থক প্রয়াস। ৪০ এর দশক থেকে এ প্রয়াসের নিমন্ত্রণ বাংলার লোকসাধারণ নিশ্চয়ই পেয়েছেন। তারপর পঞ্চাশের দশক থেকে — উত্তরবঙ্গে ৬০ এর দশক থেকে গ্রুপথিয়েটার সংস্থার মাধ্যমে নাট্যচর্চা, নাটকের বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ সমস্ত কিছুই তো লোক-দর্শকের রুচি-প্রকৃতিকে ঘিরে।

কিন্তু না, এ সমস্ত ক্ষেত্রে নাটকের যে কাহিনী, তা তৎকালীন সাময়িক পরিস্থিতির — চিরায়ত লোকজীবনের রসে ভরা নয়। কেবলই উচ্চবিত্তদের শোষণে-পেষণে লোকজীবনের স্তর নির্যাতিত, নিপীড়িত। কিন্তু চিরায়ত লোকপালায়, নাটপালায় ভক্তির পোষাকে যে লোকায়ত ভাবের বা রাগের বিস্তৃতি ঘটতো, যেখানে লোকমানুষ খুঁজে পায় তার নিজের পরিবেশ, তার মাটিজ ভাবনা, মাটিজ মানুষকে — সেই ভাব বা রাগ গণনাট্যে, গ্রুপথিয়েটারে অনুপস্থিত। তাই যাত্রা বা লোকপালায় যে পরিমাণ লোক-দর্শক থাকে, প্রসেনিয়াম-থিয়েটার মঞ্চের সে পরিমাণ লোক-দর্শক থাকেনা।"

নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় নাট্যাঙ্গনের, নাট্যঙ্গিকের, নাট্যকাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, দর্শক প্রভৃতির বিবর্তন ঘটে।

উচ্চবিত্তের মজলিসে ঘরানা থেকে নাট্যাভিনয়ের মঞ্চ সরে আসে সাধারণ নাগরিক জীবনের বিস্তৃত অঙ্গনে। এ ধারা আরো বিস্তৃত হয় গণনাট্যের নাট্যচর্চার মাধ্যমে — একেবারে সাধারণ মানুষের কুঁড়ে ঘরে। পরবর্তীকালে গ্রুপ থিয়েটার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ-পুষ্ট হয়ে সাধারণ দর্শক নিয়ে নাট্যিক কারবার করতে দায়বদ্ধ হয়। কিন্তু কার্যত: দেখা গিয়েছে এ সমস্ত দায়বদ্ধতা তত্বগতমাত্র। বস্তুত: এ সব ক্ষেত্রেও মঞ্চের সঙ্গে দর্শকের একটি 'Communication gap' থেকে গেছে। আমাদের দেশের লোকমানুষ নিরক্ষর হতে পারে, তবে মনন এবং ধারণের দিক থেকে অশিক্ষিত নয়। তারাও নাটকের মধ্যে এমন কাহিনীর আশা করে যার চিরন্তন আবেদন আছে। কিন্তু বর্তমানের নাট্যরচনা এবং তার প্রযোজনাও 'না ঘরের, না ঘাটের'। নাটক এবং নাট্যপ্রযোজনা যদি টিয়াপাখি, তোতা পাখি হয়, তবে তা স্বরূপে এবং সত্বায় যথাযথ হয়ে উঠতে পারে না। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অমিয় ভূষণ মজুমদারের বিশ্লেষণ প্রণিধান যোগ্য —"সাহিত্য নানা জিনিসের কোলাজ হয়ে চলে না; খানিকটা আলো, খানিকটা ছড়া, খানিকটা পুতুলের মতো নড়া চড়া, খানিকটা এখান ওখান থেকে প্রতীক যোগাড়, খানিকটা ইশতেহার জাতীয় স্টেটমেন্টের যে সফল নাটক হয় না।"[৯] লোক-দর্শকের পক্ষে নাটকের সহজ, সরল কাহিনী, লোক-কাহিনী যতটা গ্রহণযোগ্য হয়, সে তুলনায় অঙ্গভঙ্গির চমক, কিছটা থামা, আবার কিছটা চলা, মঞ্চে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার, কাহিনীর তল খুঁজে না পাওয়া প্রভৃতি তাদের কাছে নীরস খুঁটি নাটি মনে হয় — নাটকের কিছু নয়। তাই উত্তরবঙ্গে গ্রুপথিয়েটার-নাট্যচর্চায় বালুরঘাট ত্রিতীর্থের 'দেবাংশী' নাট্য-প্রযোজনাটি যতটা সফল হয়ে উঠতে পেরেছে, অন্য অসংখ্য নাট্য-প্রযোজনা সে তুলনায় ব্যর্থ। সুতারং প্রখ্যাত নাট্য-ব্যক্তিত্ব বিনায়ক দেবের বিশ্লেষণ সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন : *বঙ্গের নাট্যাভিনয়ের ধারায় উত্তরবঙ্গের বিশিষ্টতা লক্ষণীয় কি ?*

উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে ব্যস্ততম নট, নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক শিলিগুড়ি'র (দার্জিলিঙ জেলা) অমল

চক্রবর্তী উদ্ধৃত প্রশ্নটির যে উত্তর দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ — " নিয়মিত নাট্যচর্চা চলে আসছে সারা উত্তরবঙ্গে জুড়ে । নতুন নতুন নাট্যকারও উঠে আসছেন । এখন সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে অনেক দলেরই নিজস্ব নাট্যকার । এমনকি এদের অনেক নাটক কলকাতাতেও প্রযোজিত হচ্ছে । প্রযোজনার ধারা কিন্তু সব বঙ্গেই এক — বিদেশী ধারা । এখানে উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গকে আলাদা করা যাচ্ছেনা ।

প্রয়োগ গত ধারায় উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার মতো কোন প্রযোজনা আছে কিনা — আমার জানা নেই । তবে উন্নত মানের প্রযোজনা অনেকই হয়েছে । কিছু প্রচারের মুখ দেখতে না পাওয়ায় হারিয়ে গেছে । কিছু মানুষের মনে বাঁধা পড়েছে চিরজীবনের মত । যেমন ইতিহাসে উজ্জ্বল থাকবে কলকাতার কিছু নাটক, তেমনি উত্তরবঙ্গের কিছু প্রযোজনাও উজ্জ্বল হয়ে থাকবে মানুষের মনেই । এদের ইতিহাস লেখা হবে কিনা জানিনা — হলে পড়ে বাংলা নাটকের ইতিহাস সমৃদ্ধ হতে পারত ।

একটি প্রযোজনা সুন্দর করে তুলতে গেলে যেটা প্রথম প্রয়োজন, তা হলো অভিনয় । বিশেষত: উত্তরবঙ্গের প্রযোজনা অভিনয়-নির্ভর। কেননা প্রযোজনার অন্যান্য কৌশল যেমন মঞ্চ, আলো, আবহ ইত্যাদি থেকে অপূর্ণতা এখানে অবধারিত । এসব বিভাগে তেমন গুণীজন এখানে নেই । যে কোন বিভাগে দক্ষতা আসে পেশাগত দিক থেকে। সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে পেশাদারী নাট্যচর্চার কোনো সম্ভাবনা নেই । সেই কারণে কলা-কৌশলের ক্ষেত্রে পেশাদারী সূক্ষ্মতা উত্তরবঙ্গের প্রযোজনাগুলিতে পাওয়া যায়না । এখানে একজন আলোক শিল্পী একগাদা টাকা লাগিয়ে যে যন্ত্রপাতিগুলি কিনবেন, তা থেকে মাসিক রোজগারের পরিমাণ খুবই কম । কারণ নাট্যদলগুলির শো এর সংখ্যা তেমন নয়, যেমনটি কলকাতা শহরে । এসব খামতি পূরণ করতে হয় অভিনয় দক্ষতার সাহায্যেই । ফলে কলকাতার বহু নামী দামী অভিনেতার চেয়ে এখানকার অনেক অভিনেতারই দক্ষতা কম নয় । তবে হ্যাঁ, যে ভাষা কলকাতা শহরে সাবলীল, এখানে সেটা আঞ্চলিকতায় জারিত । ফলে একই ভাষা কলকাতা শহরে যেমন ভাবে উচ্চারিত হয়, এখানে তা হয় না। এই কারণে এখানকার অভিনেতাদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয় । কেন এমন হয়, তার অনুসন্ধান কেউ করেন না । এতদ্ সত্বেও এখানকার বেশ কিছু প্রযোজনার অভিনয়-মান এতটা উন্নতমানের যে তাকে স্পর্শ করা কোনো বঙ্গের প্রযোজনারই সম্ভাবনা নেই । একটি দুটো খুব বেশী নয় । অভিনেতাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাবনা কম । তাঁরা সারাদিন উপার্জনের ব্যবস্থায় এত ব্যস্ত থাকেন যে অন্য ভাবনা ভাববার সময়ই নেই । সেই মহলা কক্ষের সময়টুকু । এত কম সময়ের পরিধিতে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা খুবই মুস্কিল । পড়বার, জানবার, বৈচিত্রময় প্রযোজনা দেখবার সম্ভাবনা নেই । ফলে একজন অভিনেতার কল্পনা শক্তিকে পুষ্ট করবার সুযোগ নেই — যা কিছু স্বাভাবিক দক্ষতায় ।

অভিনেত্রী প্রসঙ্গে এলে তো বেশী কথা বলবারই থাকেনা । একবিংশ শতাব্দীর মুখে এসেও উত্তরবঙ্গ কুসংস্কার মুক্ত হতে পারেনি । মেয়েদের অভিনয় জগতে আসার ব্যাপারে সমাজ এখনও বিমুখ । তবু, এরই মধ্যে প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে সারা উত্তরবঙ্গের সব দলেই, সংখ্যায় কম হলেও অভিনেত্রীরা আছেন । তাঁদের মধ্যে দুচারজনের দক্ষতা স্বীকার করতে হবে । বাদ বাকীরা কাজ চালানোর মত । সাড়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে প্রতিবছরই বেশ কিছু প্রযোজনা তৈরী হয় । সেগুলিতে অভিনেত্রীরা কাজ করেন ।

একটি দলের প্রযোজনার সংখ্যা কলকাতার দলগুলি থেকে প্রায়শ:ই বেশী । খুব ভালো প্রযোজনা হলেও ১০/১৫ টি শো এর বেশী হয় না । দর্শক নেই । যানবাহন সমস্যায় বহু জনের ইচ্ছা থাকলেও দেখবার সুযোগ কম । ফলে ঘনঘন নতুন নাটকের কথা ভাবতে হয় । অথচ কলকাতা শহরের প্রযোজনাগুলি একশ, দু'শ রজনী পার হয় অনায়াসেই। ফলে সেখানকার প্রযোজনাগুলি যতটা উন্নত হয়ে উঠতে পারে, উত্তরবঙ্গে তার অনেক আগেই শেষ হয়ে যায় । কি অভিনয়, কি সামগ্রিকতা মানে পৌছবার সুযোগই পায় না । তবু, সাড়া উত্তরবঙ্গ জুড়ে অন্তত: ২৫০/৩০০ ছেলেমেয়ে নাট্য-চর্চায় মগ্ন আছেন — থেমে নেই, তাঁরা এগোবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত ।"

অমল চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ মূলক উত্তরে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার কিছুটা বিশিষ্টতা লক্ষণীয় । বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে নাট্যপ্রযোজনা অভিনয়-নির্ভর । অভিনয়ের মান অনেক সময় দক্ষিণবঙ্গকে ছাপিয়ে যায় । বহুরূপী'র অভিনয়-প্রসিদ্ধ 'রক্তকরবী', কিন্তু মিত্র সম্মিলনী (শিলিগুড়ি) প্রযোজিত 'রক্তকরবী' সে তুলনায় কম প্রসিদ্ধি লাভ করেনি । ত্রিতীর্থের 'গ্যালিলিও' কলকাতার মঞ্চে সর্বপ্রথম মঞ্চ-প্রসিদ্ধি লাভ করে । তবে উত্তরবঙ্গের নাট্য-প্রযোজনাগুলি আঙ্গিকে, আবহে এবং সংলাপের উচ্চারণে দক্ষিণবঙ্গের পর্য্যায় ভুক্ত হতে পারেনি বলে অমল চক্রবর্তী যে বিশ্লেষণটি রেখেছেন, তা সমর্থনযোগ্য । কেন পারেনি — তার পিছনে নাট্যায়নে পেশাদারিত্বের অভাব, সংস্থাগুলির নাট্য-

প্রযোজনায় দর্শক-চাহিদা বা প্রযোজকের অপ্রতুলতা, নাট্যশিল্পীদের অন্নচিন্তায় ব্যাপৃত থাকার কারণে নাট্যচরিত্রের অনুশীলনে সময়ের অভাব, সহ-অভিনয়ের সমস্যা প্রভৃতি বাস্তব কারণগুলি সক্রিয় । এছাড়াও উত্তরবঙ্গে নাট্য-সংস্কৃতির বিষয়ে আধুনিক প্রচার-মাধ্যম উদাসীন । প্রচার-মাধ্যমের এরূপ উদাসীনতায় উত্তরবঙ্গের মঞ্চ সফল প্রযোজনাগুলি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মঞ্চে ব্যাপক আকারে মঞ্চস্থ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় । এর ফলে প্রযোজনাগুলি মঞ্চের পর মঞ্চে মঞ্চস্থ হওয়ার অনুশীলন থেকেও বঞ্চিত হয় — অভিনয়ের পরিপূর্ণতা লাভ করার আগেই প্রযোজনাগুলি কালের অতলে নিমজ্জিত হয়ে যায় । তবে এত প্রতিকূলতার মধ্যেও শ্রী চক্রবর্তী উত্তরবঙ্গের মঞ্চাভিনয়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশাবাদী । অমল চক্রবর্তী উত্তরবঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্য-পরিচালক। নাট্যাভিনয়ের প্রাত্যহিক এবং চিরন্তন কলাকুশলতা সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ , যথার্থ নাট্য-প্রয়োগবিদ্ । সুতরাং উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ নাট্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর আশা নেহাতই কাল্পনিক নয়, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ । কাজেই উত্তরবঙ্গের ভবিষ্যৎ নাট্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর আশাও সমর্থনযোগ্য এবং বঙ্গের নাট্যাভিনয়ের ধারায় উত্তরবঙ্গের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা সম্পর্কে শ্রী চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ মূলক আলোচনাও যুক্তিগ্রাহ্য ।

প্রশ্ন: কলকাতার নাট্যচর্চার গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকার পরেই উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় দার্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার বিশেষ ভূমিকা ছিল — শিশিগুড়ি কি এখনও সেই অবস্থানে আছে ?

উদ্ধৃত প্রশ্ন সাপেক্ষে উত্তরবঙ্গের প্রখ্যাত নট-নাট্যকার এবং নাট্য পরিচালক শিলিগুড়ির (দার্জিলিঙ জেলা) অমল চক্রবর্তীর প্রতিবেদন — " হ্যাঁ, বনেদী মঞ্চ মিত্র সম্মিলনী'র দিকে তাকালেই বোঝা যায় — নাট্যচর্চার বয়স শিলিগুড়ি শহরে কম নয় । এই মঞ্চকে কেন্দ্র করে অতীত কালের নাট্যচর্চা দানা বাঁধে । অতীতের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম আমরা শুনি, যাদের অনেকেই এখন জীবিত অথবা মৃত । মিত্র সম্মিলনী বহু প্রযোজনা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছে, সারা বাংলা নাট্য-প্রতিযোগিতা চালিয়েছে এবং এই মঞ্চকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শিলিগুড়িতে নাট্যচর্চা । পরবর্তীকালে যে নাট্য-জোয়ার এসেছিল, তারই মুখবন্ধ করেছিল মিত্র সম্মিলনী । বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়ে যে সংগঠনটি সারা বাংলায় সাড়া ফেলেছিল, তার নাম 'কথা ও কলম' । 'কথা ও কলম' শিলিগুড়ি শহরে নাট্যচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে । সেই সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যসংস্থা শিলিগুড়ি'র নাট্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে । সত্তর দশক ছিল স্বর্ণময় যুগ । এই দশকেই জন্ম নেয় অনেক নাট্যদল । তাদের নাট্যচর্চা দর্শকদের আকৃষ্ট করে । তখন একটি নতুন প্রযোজনা দর্শকদের আসন পূর্ণ করে দিত । একটি প্রযোজনার ভালো মন্দ নিয়ে পথে-ঘাটে, চায়ের দোকানে বিতর্কের ঝড় উঠতো । এই সময়ের প্রেক্ষাপটেই তৈরী হয় অত্যাধুনিক নাট্যশালা 'দীনবন্ধু মঞ্চ'। জন্ম নেয় যৌথ নাট্য-সংগঠন — মুক্তমঞ্চ । মুক্তমঞ্চের উদ্যোগে সংগঠিত হয় বিভিন্নস্তরের সাংস্কৃতিক আন্দোলন । যে কোন বৈষম্য, অবিচার, অন্যায়, অশ্লীলতার বিরূদ্ধে সোচ্চার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল নাট্যকর্মীরা মুক্তমঞ্চের মাধ্যমেই। শহরের বেশীর ভাগ নাট্যদলই এর সাথে যুক্ত ছিল । প্রতি রবিবার মাঠ ভরে যেত মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠান দেখতে । শিলিগুড়ি তখন কলকাতার নাট্যচর্চাকে ধাক্কা মারতে শুরু করেছে । মঞ্চেও অনেক প্রযোজনা উপস্থাপিত হচ্ছিল, যা কলকাতার প্রথম সারির প্রযোজনাগুলির সমতুল । ইতিমধ্যে দূরদর্শন এসে নাট্যচর্চায় দর্শক সমাগমে ঘাটতি ঘটালো । শূন্যতা তৈরী হল দর্শক আসনে এবং নাট্যচর্চায় । আশির দশকের মাঝখান থেকেই বেশীর ভাগ নাট্যদলেরই প্রযোজনার মান নিম্নগামী হতে শুরু করল। সেটা শুধু শিলিগুড়িতে কেন— সমস্ত বঙ্গেই। সত্তর দশকের মানসম্পন্ন প্রযোজনার তুলনায় পরবর্তীকালের প্রযোজনার মানের ঘাটতি ঘটে গেল । এর জন্য দূরদর্শন কে অনেকে দায়ী করলেও সেটাই সব নয় । আসলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে নাট্যচর্চায় তেমন সাড়া জাগেনি । নানা কারণ তার জন্য দায়ী ।"

শিলিগুড়ি'র মঞ্চাভিনয়ের সফলতা বর্তমান প্রতিবেদক আশির দশকের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন এবং নাট্যাভিনয়ের মান কোন কোন সময় কলকাতার নাট্য মঞ্চের প্রভাব ছাপিয়ে যেত — তাও প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন । কিন্তু আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের পরে থেকে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চার অবস্থান আগের মত কিনা — সে বিষয়ে প্রতিবেদক অমল চক্রবর্তী স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি । তবে আশির মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় যে কিছুটা ভাটার টান পড়েছে — সে ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট স্বীকার না করলেও নাট্যচর্চার ভাটার টানের কারণ হিসাবে দূরদর্শনের প্রভাব খানিকটা — আর নতুন প্রজন্মের মধ্যে নাট্যচর্চার প্রতি একান্ত উদাসীনতা বেশী পরিমাণে বর্তমান— এই বিশ্লেষণটি তুলে ধরেছেন । বর্তমান প্রতিবেদকের বিশ্লেষণ বিন্দুমাত্রও সমালোচনার অপেক্ষা রাখেনা । দূরদর্শনের পর্দায় সস্তা চটকদারী নাটক বর্তমান প্রজন্মের স্বভাব সুলভ দৃষ্টি-নান্দনিকতাকে

প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাদের চেতনায় জীবন কেবল রঙিন স্বপ্ন-মাদকতা অথবা শুষ্ক মরুভূমির নিষ্প্রাণতা। তাই তারা কখনো উৎকট উল্লাস অথবা depression এর শিকার। এদের উদ্যোগ নেই, অধ্যাবসায় নেই এবং বিষয়-নির্দিষ্ট নিষ্ঠাও নেই। এরা সম্পূর্ণতই আত্মকেন্দ্রিক অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে সামাজিক। এর ফলে উত্তরবঙ্গে নাট্যচর্চা সেই ১৮৭০ খ্রী: থেকে শুরু হলেও ১৯৮৫ খ্রী: এসে কিছুটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে — যা চলছে, তা সেই পূর্বতন উদ্যোগ কে কাজে লাগিয়ে। সুতরাং অমল চক্রবর্তীর পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ কিছুটা প্রচ্ছন্ন হলেও সমর্থনযোগ্য।

প্রশ্ন : বালুরঘাট (দক্ষিণ দিনাজপুর) প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক নদীগুলি যথা আত্রেয়ী, পুনর্ভবা প্রভৃতির নৈসর্গিক প্রভাব পরিপুষ্ট এবং 'বাণগড়', 'গঙ্গারামপুর' প্রভৃতি প্রাচীন বাংলার ঐতিহাসিক স্থান লগ্ন হওয়া সত্বেও বালুরঘাটের নাট্যমঞ্চগুলির নাট্যচর্চায় এবং স্থানীয় নাট্যকারদের নাট্যরচনায় সেই প্রাচীনত্বের মহিমাকে স্বীকার করে নেওয়ার কোন প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হয়নি কেন ?

এই প্রশ্নটি বালুরঘাটের নাট্যমনস্ক ব্যক্তিত্ব এবং প্রত্নতাত্বিক অধ্যাপক শ্রী অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী'র নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছিল। শ্রী যুক্ত গোস্বামী মহাশয় এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতটি জানান — "আত্রেয়ী-পুনর্ভবা-টাঙ্গন-শ্রী-যমুনা-বিধৌত দিনাজপুর জেলায় ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত অনেক দীঘি, শিল্পকর্ম, লেখমালা প্রভৃতি থাকা সত্বেও বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেও দিনাজপুর ছিল উপেক্ষিত। তাছাড়া হিংস্রজন্তু অধ্যুষিত ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। পশ্চিমভাগটি অত্যন্ত দুর্বল। কালীশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কৃষকেরা খাজনা না দেবার আন্দোলনে সাময়িকভাবে সামিল হলেও যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারলে গণ আন্দোলন করা যায়, সেই ধরণের মানসিকতা তৈরী করার মত নেতৃত্ব বা চিন্তাধারা এখানে ছিল না।

বাণগড়ের (১৯৩৮ - ১৯৪১ খ্রী:) খনন কার্য সাধিত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত স্থানীয় মানুষজনের মন ঊষা - অনিরুদ্ধের কল্প জগতেই বিচরণ করতো। তখনও তাঁরা বাণরাজার কাহিনী, ঊষা-অনিরুদ্ধের প্রেম — শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে বাণের যুদ্ধ ও বিনাশ এই কল্প কথা বলে গর্বিত বোধ করেন। ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ এখনও ঘটেনি। অতীতের কথা বলার দরকার আছে কি ?

১৯০৯ খ্রী: থেকে এখানে একটি মঞ্চ থাকলেও মঞ্চটি ব্যবহৃত হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের সৌখীন নাট্যচর্চার কেন্দ্র হিসাবে। 'শিল্পের জন্য শিল্প' (Arts for Art's sake) বা 'বাঁচার তাগিদেই শিল্প '(Art's for life's sake) এ দুটির কোনোটার মধ্যেই তাঁরা ঢোকেন নি। তাঁদের চিন্তাধারা অতিনাটকীয়তা ধর্মী পঞ্চাঙ্ক নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পৌরাণিক কাহিনী কিংবা ইতিহাস-নির্ভর কিছু রোমান্টিক নাটককে যাত্রার ঢঙে উপস্থাপিত করে দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনের পর হাততালি পাবার উদ্দেশ্যেই তাঁরা নাটক করতেন।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বালুরঘাট দিনাজপুর জেলার মহকুমা শহর হওয়ায় কর্মব্যপদেশে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু মানুষ এখানে আসেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম করার পর সান্ধ্যকালীন আড্ডা বসতো ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে তৈরী অস্থায়ী মঞ্চে। নাটকের মহড়াও চলতো। এই হচ্ছে গোড়ার কথা।

নাট্যকার মন্মথ রায়ই প্রথম যিনি বখ্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয় বিষয়টি নিয়ে 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি (পঞ্চাঙ্ক) রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির অভিনয় সারা রাতেও শেষ হয়নি। তখন তিনি 'মুক্তির ডাক' নামে একটি একাঙ্কিকা রচনা করেন, যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাভাষায় রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাংলার অরাজকতার প্রেক্ষাপটে 'বখতিয়ারের বাংলা জয়' এই বিষয় নিয়ে তাঁর উক্ত নাটকটি রচনার উদ্দেশ্যই ছিল ঐ সময়ে গঙ্গারামপুর ও সন্নিহিত এলাকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কে তুলে ধরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত' নাটকে পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের অভ্যুদয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর কয়েকটি নাটকে কোন কোন জায়গায় এখানকার কথা বলার চেষ্টাও তিনি করেছেন। তবে এই অঞ্চলের তথ্য তুলে ধরাটা সেখানে গৌণ।

শিব প্রসাদের 'প্রতিষ্ঠা' নাটকের শেষে রামপালের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সাম্যের জয়গান গাওয়া হলেও, তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। মন্মথ রায় ও শিবপ্রসাদ দুজনেই রোমান্টিকতার অধীন। ফলে তাঁদের কাছে গণচেতনাধর্মী নাটক আশা করা অনুচিত। নীহার ভট্টাচার্য পেশার খাতিরে জার্মান নাটক অনুবাদ করেছেন। আর বাকী যাঁদের নাম আছে — পরেশ ঘোষ, অধ্যাপক নির্মলেন্দু তালুকদার, শুভ্রাংশু মৈত্র, অধ্যাপক অজিতেশ ভট্টাচার্য, অমলেশ মিত্র,

অধ্যাপক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ — তাঁরা নাকি লেখার জন্যই লিখেছেন । তাঁরা নাট্য আন্দোলনের কথা বললেও নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলন — কোনটারই সাথী কিনা গবেষণা-সাপেক্ষ । আর ইতিহাস না জানলে প্রাচীনত্বের মহিমা তুলে ধরবেনই বা কি করে ?"

অধ্যাপক অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী'র বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ উত্তর নি:সন্দেহে সমালোচনার অবকাশ রাখেনা । তবে বালুরঘাটের নাট্যমানসিকতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। হরিচরণ সেন,[১০] দিগিন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়[১১]— এদের নাট্যপ্রয়াস থেকে শুরু করে শিব প্রসাদ কর, মন্মথ রায়, নরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী মুখোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন গুহ, অমিয় সেন, জীবু রায়, জিতেন সমাজদার, তুলসী চন্দ, অবিনাশ দত্ত, সনৎ সেন, হরি মাধব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অসংখ্য অবিসংবাদিত নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, মঞ্চশিল্পীর জন্ম, বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘটিয়েছে প্রাচীন এবং আধুনিক বালুরঘাটের নৈসর্গিক পরিবেশ এবং আর্থ সামাজিক পরিবেশ । সুতরাং পরিবেশ-সম্পৃক্ত নাট্য ভাবনা বালুরঘাটের নাট্য মঞ্চে, নাট্যরচনায় প্রতিফলিত হওয়ায় সম্ভাবনা অমূলক নয় । বিশেষত: উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় বালুরঘাট শীর্ষদেশে অবস্থান করছে । তবে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের লেখা নাটক 'মন্ত্রশক্তি' এ অঞ্চলের 'তেভাগা আন্দোলনে'র প্রেক্ষাপটে রচিত এবং হরিমাধবের 'খারিজ', 'দেবাংশী' এ অঞ্চলের মাটিজ ভাষায় আঞ্চলিক সমাজ-মানসিকতা এবং সমাজ-বিশ্বাস কে তুলে ধরার প্রয়াসে সমৃদ্ধ হয়েছে । 'দেবাংশী' নাট্য-প্রযোজনাটি তো উত্তরবঙ্গে কেবল নয়, বৃহত্তর বঙ্গেরও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে । ' মন্ত্রশক্তি ' বালুরঘাট সংলগ্ন খাঁপুর-অঞ্চলে বিস্তৃত তেভাগা আন্দোলনের সাড়া জাগাতে পারেনি — এক্ষেত্রে এতদ্ অঞ্চলের গণ মানসিকতায় আন্দোলনমুখী চেতনার অভাব ছিল, ঠিক যেমন অভাব ছিল ইতিহাস-চেতনার । সুতরাং সেদিক থেকে অধ্যাপক অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর বিশ্লেষণ সমর্থন যোগ্য ।

প্রশ্ন : *ঐতিহাসিক 'তেভাগা' আন্দোলনের উৎস-স্থান 'খাঁপুর' বালুরঘাট সংলগ্ন স্থান — অথচ সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের রূপায়ণ বালুরঘাটের নাট্যমঞ্চগুলিতে প্রযোজিত হলে সার্থক গণ আন্দোলনের রূপ নিতে পারতো, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা হয়নি কেন* — এ সম্পর্কে প্রত্নতাত্বিক অধ্যাপক শ্রী অচিন্ত্যকৃষ্ণ গোস্বামীর অভিমত — " 'তেভাগা আন্দোলন' নি:সন্দেহে ঐতিহাসিক এবং দিনাজপুর শহর ছিল তার মূলকেন্দ্র । তবে খাঁপুরে যা ঘটেছিল তার গভীরে না পৌঁছাতে পারলে বা খাঁপুরের আন্দোলনের সময় বালুরঘাটবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে না পারলে আপনি সংস্থাগুলির কাছে যা প্রত্যাশা করেছেন, তার সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না । যে মানসিকতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্ঠা থাকলে আন্দোলন করা যায়, এখানে তা এখনও নেই। নিজের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন ছাড়া (সেটা যেভাবেই হউক না কেন) মূলত: এখানকার নাট্যকার বা অভিনেতাগণের আর কোন চিন্তাই ছিল না। মাঝে মাঝে কথাবার্তায় ও নাট্য-প্রযোজনায় আন্দোলন ধর্মী ভাব দেখা গেলেও তা সৌখীন মজদুরী মাত্র । "

'মিশ্র ধর্মসংস্কৃতির এই বরেন্দ্রভূমিতে অজস্র লোকগাথা আজও আধুনিক নাট্যচর্চার অনুপ্রেরণা জোগায়'— এ মন্তব্যটি বালুরঘাটের অপর এক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নির্মলেন্দু তালুকদারের।[১২] তাঁর এই মন্তব্যটির আলোকে বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা — নাট্যমন্দির, নাট্যতীর্থ, ত্রিতীর্থ, আত্রেয়ী প্রভৃতির নাট্য-প্রযোজনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই বরেন্দ্র ভূমিজ অজস্র লোকগাথা সম্পৃক্ত 'দেবাংশী' ছাড়া আর একটি নাটকও রচিত এবং মঞ্চস্থ হয়নি । উক্ত তালুকদার মহাশয় আরও বলেন — " রংপুরের কৃষক নেতা নুরুলদীনের নেতৃত্বে এই জেলার মানুষেরা যেমন নীল বিদ্রোহে অংশ নিয়েছেন, তেমনি এ জেলার মানুষেরা বাঁচার লড়াইয়ে তেভাগা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছেন । যশোদা বর্মনকে আজও আমরা ভুলিনি ।"[১৩] তালুকদার মহাশয়ের মন্তব্য-নির্দিষ্ট ঘটনাগুলি ইতিহাস-সম্মত । কিন্তু সেই ঘটনাগুলি বালুরঘাটের জন-মানসে কতটা রেখাপাত করেছে — সে নিরিখে সামাজিক আন্দোলনমুখী সাড়া জাগানো কোনো নাটক, কোনো নাটপালা বালুরঘাটের মঞ্চগুলিতে অনুষ্ঠিত হয়নি । একমাত্র স্থানীয় নাট্যকার হরিমাধবের ' মন্ত্রশক্তি ' (১৯৯৪ খ্রী:) ছাড়া আর কোনো নাটক নেই যেখানে বরেন্দ্রভূমির ভূমিজ সন্তানের বাঁচার লড়াই এর সোচ্চার সংলাপ শোনা যায় । সুতরাং আন্দোলনমুখী নিষ্ঠা, দৃঢ়তা-সমৃদ্ধ মানসিকতার অভাব এ অঞ্চলের বরাবরের । তাই এ অঞ্চলের নাট্যমঞ্চগুলির প্রযোজনায় উক্ত ইতিহাস-সম্মত ঘটনাগুলির নাট্যরূপায়ন ঘটেনি । সুতরাং উদ্ধৃত প্রশ্ন সাপেক্ষে অধ্যাপক গোস্বামী'র বিশ্লেষণ সম্পৃক্ত উত্তর যথাযথ ।

প্রশ্ন : নাটক মূলত: দৃশ্যকাব্য বলেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চাবিকাঠি হতে পারে— এক্ষেত্রে বালুরঘাট উত্তরবঙ্গের নাট্যখনি হয়েও সমাজ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশারী বলিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার

স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারেনি কেন — এ বিষয়ে বালুরঘাট তথা পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য নট-নাট্যকার, নাট্য-প্রযোজক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের পান্ডিত্যপূর্ণ অভিমত — " চাবিকাঠি বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন? প্রধান অস্ত্র বা হাতিয়ার? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার স্বত:সিদ্ধে আমার ঘোর আপত্তি আছে। নাটক অন্যান্য হাতিয়ারের মধ্যে অন্যতম একটি — এর বেশি কৃতিত্ব কিংবা গুরুত্ব নাটক দাবী করতে পারেনা। দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতার আকাংক্ষা, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী, বহু বিবাহ, বালবিবাহ, সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার, পীড়ন, বিচার-ব্যবস্থার অসাধুতা ইত্যাদি নানা সামাজিক প্রথা, ব্যাধি, কুসংস্কার বারবার বাংলা নাটকের বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে। বাংলা নাটক তার ঐতিহ্যময় প্রতিবাদী চরিত্র বজায় রেখেছে এখনও। উত্তরবঙ্গের নাট্যচর্চায় এই বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট নয় কেন — এ বিষয়ে আপনার মতামত না জেনে কোন প্রতিক্রিয়া জানান সম্ভব নয়। বালুরঘাট যে সব প্রযোজনা উপহার দিয়েছে, উত্তরবঙ্গ কেন কলকাতার বহু দলই সে সব নাট্য-প্রযোজনার কথা কল্পনা করতে পারবেন না। জল, দেবীগর্জন, দেবাংশী, ছেঁড়াতার, মন্ত্রশক্তি, গ্যালিলিও, তিনবিজ্ঞানী, অনিকেত এসব প্রযোজনা বালুরঘটের উপহার। এসব প্রযোজনায় বলিষ্ঠতার অভাব ছিল, এমন কথা শত্রুও বলেনি। আপনি নাটক নিয়ে গবেষণা করছেন কিন্তু আমার আশংকা এসব কোন প্রযোজনাই আপনি দেখেন নি। এই সব কেতাবী প্রশ্নের কোন সারবত্তা নেই। উত্তরবঙ্গের কথ্যভাষা, লোকজীবনের ধর্ম, রিচ্যুয়াল, গান সব কিছুই যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে এসব নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে।"

শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এটুকু বলতে পারা যায় যে 'জল,' 'দেবীগর্জন' উক্ত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজিত মঞ্চসফল বলিষ্ঠ নাটক দুটি উত্তরবঙ্গের সমাজ-পটভূমিকায় পরিপুষ্ট আলেখ্যের আলোকে নাটক নয় — 'জল' এর পটভূমিকা 'চরসা' নদীর বিস্তীর্ণ চর — মহাশ্বেতা দেবীর গল্প, নাট্যরূপ হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, 'দেবীগর্জন' — বিজন ভট্টাচার্য। নাটক দুটি অন্ত্যজ শ্রেণীর রিচ্যুয়াল হলেও এখানে উত্তরবঙ্গের লোকধর্ম, বিশ্বাস, রিচ্যুয়াল প্রোথিত হয়নি। এছাড়া গ্যালিলিও, তিনবিজ্ঞানী— এই প্রযোজনা দুটি তো নীহার ভট্টাচার্য্যের জার্মান নাটকের অনুবাদিত নাটক, ' অনিকেত' আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে শ্রীযুক্ত হরিমাধবের লেখা রূপান্তরিত নাটক — মধ্যবিত্ত মানসিকতার পট পরিবর্তনের পটভূমিকায় নাট্য-রূপায়িত। কাজেই কেবলমাত্র 'দেবাংশী' এবং ছেঁড়াতার এই প্রযোজনা দুটি উত্তরবঙ্গের সমাজ-মানসিকতার পটভূমিকায় রচিত — প্রথমটি অভিজিৎ সেনের গল্প, পশ্চিম দিনাজপুরের কথ্যভাষায় (পলি ভাষা) এবং পশ্চিম দিনাজপুরের সামাজিক রিচ্যুয়ালের পরিকাঠামোয় রচিত, দ্বিতীয়টি রঙপুরের ভাষায়, রঙপুরের সামাজিক পটভূমিকায় গ্রথিত উত্তরবঙ্গের সফল নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর অনবদ্য কৃতি। আরো একটি নাট্য-প্রযোজনা 'মন্ত্রশক্তি' — পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট সংলগ্ন খাঁপুরে সংঘটিত 'তেভাগা আন্দোলনে'র পটভূমিকায় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সূত্র অনুসারে শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের রচিত। এই প্রযোজনাটিও উত্তরবঙ্গের সমাজ আন্দোলনের প্রেক্ষিত স্থান নির্দেশ করে। সুতরাং শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখিত সব কটি নাট্য-প্রযোজনা নয় — কেবলমাত্র তিনটি নাট্য-প্রযোজনা উত্তরবঙ্গের সমাজ-পটভূমিকায় রচিত, মঞ্চায়িত এবং উত্তরবঙ্গের মৌলিক ভাবনায় রসোত্তীর্ণ শিল্পকৃতি। কিন্তু ছেঁড়াতার ছাড়া আর দুটি নাট্য-প্রযোজনা ততোটা উৎকর্ষ লাভ করেনি। সমাজ-আন্দোলনের বাঁধন উক্ত নাটক দুটিতে ততোটা আবেদনমুখী হয়ে উঠেতে পারেনি। 'দেবাংশী' র নাট্যবন্ধনে যে লৌকিক বিশ্বাস মানুষের মধ্যে দেবতার অস্তিত্বকে সামাজিক ধর্ম রূপে মানুষকে বরণ করে নিতে শিখেয়েছিল, নিছক একটি লম্পট চরিত্রের বিরূদ্ধে সমাজ-মন জাগিয়ে তুলতে সেই দেবাংশী'র দেবত্ব দূর করে দিয়ে তাকে মানবত্বের ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড় করানোর যে উদ্দেশ্যবাহী সমাজ-মানসিকতার আয়োজন, তা কোনো ভাবেই শিল্প-সম্মত হয়নি। অন্যদিকে 'মন্ত্রশক্তি' নাটকটি 'তেভাগা আন্দোলনে'র পটভূমিকায় রচিত হলেও নাটকটির বন্ধন বড়ই শিথিল, নাটকটির গতিও স্তিমিত এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আন্দোলনের মেজাজ হীন। যশোদা বর্মন চরিত্রটি ঐতিহাসিক চরিত্রের মাহাত্ম লাভ করেনি, তেভাগা'র কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়েও মেজাজে এবং মননে দর্শকের কাছে উদ্দীপনাময় চরিত্র হয়ে উঠতে পারেনি। সুতরাং নাট্যবন্ধনের শিথিলতাও বলিষ্ঠ নাট্য-প্রযোজনার স্বীকৃতি আদায় না করার অন্যতম কারণ। এর ফলে দর্শকমনে সমাজ আন্দোলনমুখী কোনো উদ্যোগ চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। ফলশ্রুতিরূপে সমাজ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দিশারী হয়নি উক্ত প্রযোজনাগুলি। কাজেই পন্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের অভিমত উক্ত প্রশ্ন সাপেক্ষে অংশত : সমর্থনযোগ্য হলেও সার্বিক সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রশ্ন: ঐতিহাসিকদের মতে বাংলা একাঙ্ক নাটকের জনক মন্মথ রায় উত্তরবঙ্গের ভূমিজ সন্তান । সেই মন্মথ রায় মননে, দর্শনে এবং অভীক্ষায় অবিভক্ত বাংলার বালুরঘাটের মাটির প্রভাব-পরিপুষ্ট । কিন্তু তাঁর নাটকগুলিতে বালুরঘাট তথা উত্তরবঙ্গের সামাজিক, ঐতিহাসিক, লৌকিক, অলৌকিক, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কোনো ভাবেরই প্রতিফলন ঘটেনি কেন ?

উদ্ধৃত প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন – "আমি এ বিষয়ে বলেছি, লিখেছি । এই অনুপস্থিতি বহু পূর্বে আমার নজরে এসেছে । এর কারণ কি ? তা আপনারা, গবেষকরা ব্যাখ্যা করবেন । এ কাজ আপনাদের, আমার নয় । তিনি কথায়, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে বহু বার বালুরঘাট সম্পর্কে খুব আবেগঘন মন্তব্য করেছেন — কিন্তু তার কোন Major নাটকে বালুরঘাটের নাম তো দূরে থাক, গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। এই বিষয়টি আমাকে বিস্মিত করে । নিজের পরিপার্শ্ব, ছাত্র, কর্মজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বালুরঘাট । তবু তাঁর সৃষ্টির কোন স্থানে তাঁর ধাত্রীমাতার স্থান হয়নি ।"

বালুরঘাটের নাট্যব্যক্তিত্ব অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন " মন্মথ রায়ই প্রথম যিনি বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়কে বিষয় করে 'বঙ্গে মূসলমান' নাটকটি (পঞ্চাঙ্ক) রচনা করেছিলেন । কিন্তু এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির অভিনয় সারা রাতেও শেষ হয়নি । তখন তিনি ' মুক্তির ডাক ' নামে একটি একাঙ্কিকা রচনা করেন — যা বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে বাংলাভাষায় রচিত প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে । লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বাংলার অরাজক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বখতিয়ারের বাংলা জয় — এই বিষয় নিয়ে তাঁর 'বঙ্গে মুসলমান' নাটকটি রচনার উদ্দেশ্যই ঐ সময়ে গঙ্গারামপুর ও সন্নিহিত এলাকা'র রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে তুলে ধরা।... পরবর্তীকালে মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত' নাটকে পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের অভ্যুদয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর কয়েকটি নাটকে কোন কোন জায়গায় এখানকার কথা বলার চেষ্টাও তিনি করেছেন । তবে এ অঞ্চলের তথ্য তুলে ধরাটা সেখানে গৌণ ।" সুতরাং অচিন্ত্য কৃষ্ণ গোস্বামী'র বিশ্লেষণ সাপেক্ষে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায় যেখানে মন্মথ রায়ের নিজস্ব সৃষ্টি সম্ভারে মাটিজ অস্তিত্বের অনুপস্থিতি প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন, তা সর্বাংশে সত্য নয় । ড: অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী মন্মথ রায় সম্পর্কে একটি গবেষণা গ্রন্থ লিখেছেন । সেই গ্রন্থে অস্পষ্ট ভাবে মন্মথ রায়ের দেশজ বন্ধন ফুটে উঠেছে । তবে বালুরঘাটের পার্শ্বস্থ বখতিয়ারের বাংলা বিজয় এবং পালবংশীয় রাজা গোপালের অভ্যুদয় কাহিনীর নাট্যায়ন ছাড়া অন্যান্য নাটকে আঞ্চলিক তথ্য তুলে ধরার ব্যাপারটি সম্পূর্ণত: বিচ্ছিন্ন প্রয়াস । তাঁর ' অমৃত অতীত ' নাটকটিতে কৈবর্ত বিদ্রোহের পটভূমিকা বর্তমান থাকলেও তা রূপকের ধোঁয়ায় অত্যন্ত অস্পষ্ট । অবশ্য এ নাটকটিতে তিনি বালুরঘাট তথা উত্তরবঙ্গের সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন অনায়াসেই ঘটাতে পারতেন । তাঁর মঞ্চ সফল পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি — ' কারাগার ', মহুয়া, অশোক, খনা, জীবনটাই নাটক, মমতাময়ী হাসপাতাল প্রভৃতি এবং তাঁর অসংখ্য একাঙ্ক নাটকে স্থানীয় সমস্যার আলেখ্যে কোনো নাট্যমুহূর্তই তৈরী হয়নি । তাঁর সফল নাটকগুলির বেশীর ভাগই পৌরাণিক উপাদানের নাটকীয় সমীকরণে বর্তমান সমস্যা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে — " Sri Roy has used old material to reflect modern problems, modern feelings, modern attitudes ."১৪ সুতরাং প্রশ্ন সাপেক্ষে শ্রীযুক্ত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সম্পূর্ণত: না হলেও বেশীর ভাগ অংশেই সমর্থনযোগ্য ।

সূত্র নির্দেশ :

১) কোচবিহারের ইতিহাস — ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা ড: নৃপেন্দ্র নাথ পাল, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ খ্রী:, পৃ: ১৬০ ।

২) Speech delivered by His Highness Maharaja Sir Jitendra Narayan Bhup Bahadur, K. C. S. I. to the students of victoria college on the 24 th of March'1921 — পৃ: ১৬১ , কোচবিহারের ইতিহাস — ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনা ড: নৃপেন্দ্রনাথ পাল, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ খ্রী: ।

৩) নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর — সুনীল দত্ত, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ , পৃ: ২১৮ ।

৪) Tulane Drama Review — vol, 7, No 4 , P – 7.
৫) Tulane Drama Review — vol, 7/4 – P, 15.
৬) নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর — সুনীল দত্ত, পৃ: ১৩০ ।
৭) তদেব , পৃ: ১৪০ ।
৮) স্মরণিকা, জলপাইগুড়ি, কলাকুশলী, অষ্টাদশ পূর্তি উৎসব, ১৯৭৪-১৯৯২ খ্রী:, প্রকাশক—দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।
৯) স্মরণিকা, স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, কোচবিহার —৭ম বর্ষ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে প্রকাশিত —১৯৭৮-১৯৮৯ খ্রী: ।
১০) স্মরণিকা, বাংলার মুখ, ২৬ নভেম্বর , ১৯৯৭ খ্রী: ।
১১) দিনহাটা, প্রগতি নাট্যসংস্থার নট-নাট্যকার এবং নাট্য-পরিচালক অধ্যাপক অলোক গঙ্গোপাধ্যায় ।
১২) মধুপর্ণী, পঞ্চবিংশ বর্ষ, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলাসংখ্যা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ।
১৩) তদেব ।
১৪) The story of the calcutta Theatres 1753 — 1980 by Sri Sushil Kumar Mukherjee , Principal and Head of the department of English, Scottish church College, Calcutta (Retired).